SPANDAN

Paschim Pune Bangiya Parishad Estd- 2004

স্পন্দন

পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ

শারদীয়া পত্রিকা

দ্বিতীয় সংখ্যা [অক্টোবর ২০১৯]

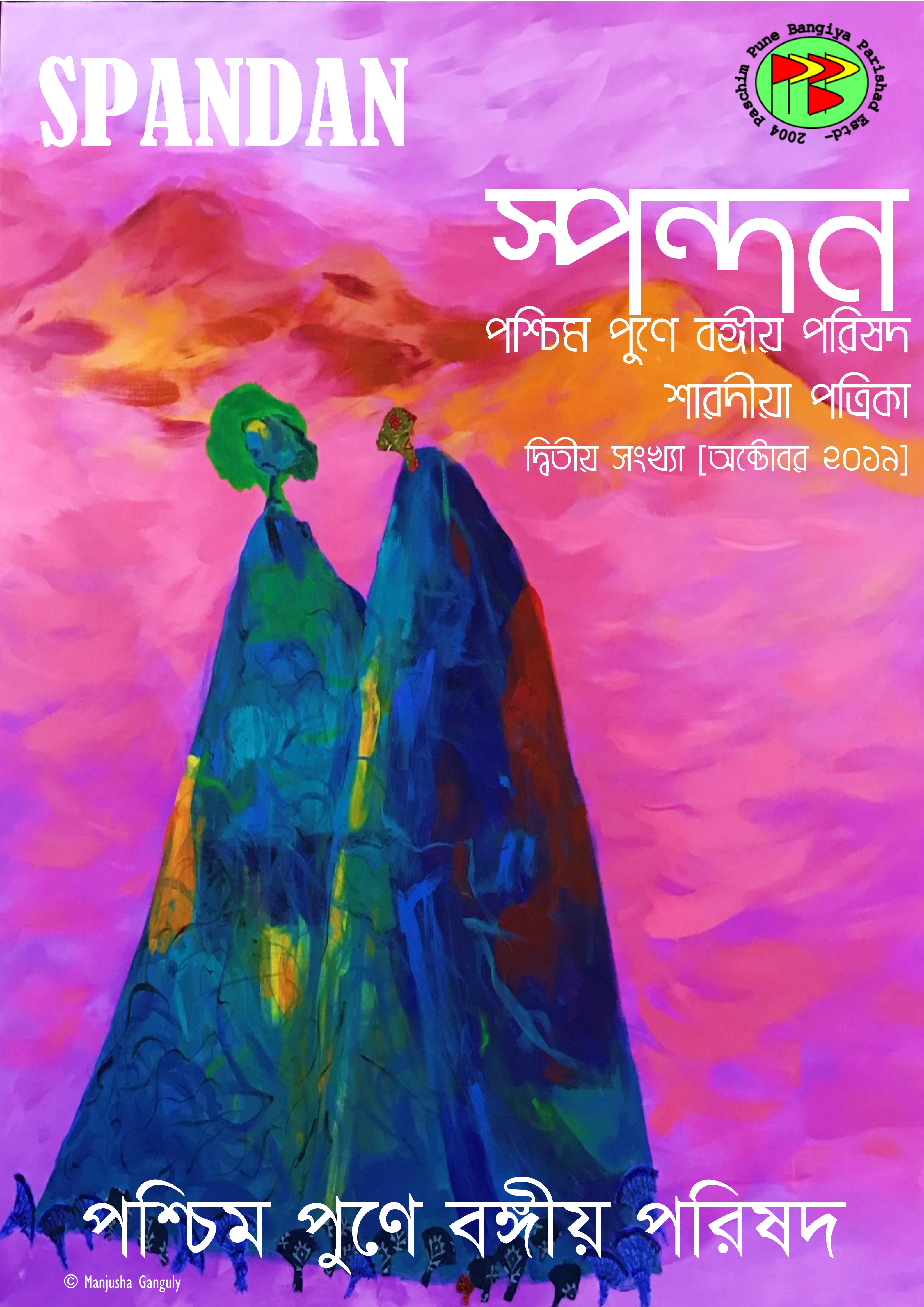

পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ

© Manjusha Ganguly

সূচীপত্র

FOREWORD 5
সম্পাদকীয় 6
অয়ি গিরিনন্দিনী* 9
বেঁচে আছি 12
During Durga Puja This Weekend 15
পুজো পরিক্রমা* 16
উল্টো রথ 18
অমানবিক 20
সিলেটের দুর্গাপুজো এবং এক ভোজন রসিকের আক্ষেপ* 21
কোথাও সে রয়েছে নিশ্চিত 23
পঞ্চাশ পেরিয়ে 25
বুড়ো বুড়ীর কাজিয়া 26
বোঁচার মার পাঁচালি 30
War: A gateway to hell 32
মৃত্যুরহস্য 33
One More Due 36
টান 38
সিন্ডেরেলা 40
A hope within hope… 44
৭ই সেপ্টেম্বর 46
চাওয়া পাওয়া 49
অপাঠ্য- পুস্তক 52
THE WORLD OF PPBP… 55

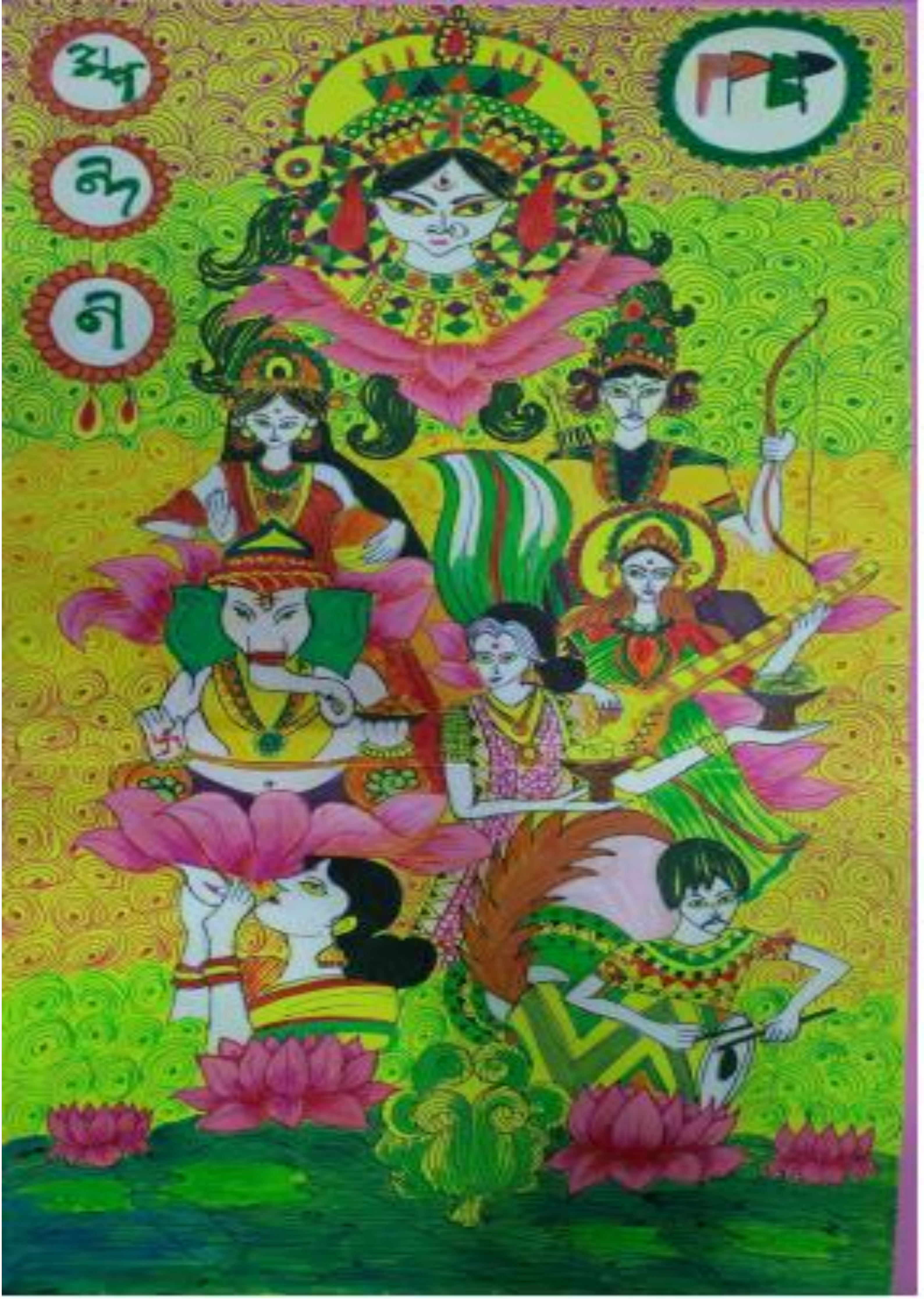
অ
ঞ্চ
ল

FOREWORD

My Dear Friends,

The festival season is again with us, which we have been looking forward to for the whole year, as usual! This is the time when we really put all our worries, differences, stresses & tensions behind and join the festivities. We at PPBP started out over a decade and a half back to start our Shree Shree Durga Puja with a set of different approach from the normal ways in which our friends in other associations in Pune conducted their Pujas, and we had termed this set of differences as “Core Values of PPBP” which has been the bedrock on which we have been building PPBP since. Also these “Core Values” had been arrived at after a lot of discussions & soul searching.

There were a lot of scepticism at the outset, as to whether this novel approach would survive the test of time, and become a permanent way of organising the Puja and our beloved PPBP. However, that scepticism was over on the very first day of our very first Puja, and the entire PPBP Family has not looked back ever since. Members have not only been patronising it wholeheartedly, but we have been successfully expanding our memberships and also enhancing our cultural activities and social work continuously. Just to give a few examples, PPBP has commenced on undertaking Social Services in and around Pune in order to, what we term as, **“Give Back To The Society”**. A second initiative is to conduct **PPBP Day**, which we started for the first time this year, with an express objective of showcasing our local, home-grown talents to the discerning audience of Pune.

We are sure these initiatives will be strengthened over time with your active participation, and also be able to enhance their qualities. This Magazine is another example towards this initiative, which has entered its second year, and we are confident that it will also continue to blossom in the years to come.

On behalf of The Management Committee as well as on my personal behalf, we take this occasion to wish each one of you and the members of your family, **A Very Happy Durga Puja** and Festival Time.

Sincerely,

Dr. Bidyabijay Bhoumik

President, Pashchim Pune Bangiya Parishad

সম্পাদকীয়

“আজ দেবীপক্ষের প্রাক-প্রত্যুষে জ্যোতির্ম্ময়ী জগন্মাতা মহাশক্তির শুভ আগমন-বার্তা আকাশ-বাতাসে বিঘোষিত..” আজ মহালয়া - দেবীপক্ষের সূচনা। বীরেন ভদ্রের জলদগম্ভীর চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আপামর বাঙ্গালীর প্রাণের উৎসবের। আর আমাদের পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদের সাহিত্য পত্রিকা 'স্পন্দন' এর (বৈদ্যুতিন) দপ্তরে এখন দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। স্পন্দন এর প্রথম আত্মপ্রকাশের পর পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সূর্যকে একবার আবর্তন করে এসেছে। আর আমরা পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অ-বাসযোগ্য করে তুলবার দিকে আরো একটুখানি অগ্রসর হয়েছি।

পঞ্জিকামতে দেবী দুর্গার এবছর ঘোটকে আগমন। নির্গমনও। দেবীর গমনাগমন (সপ্তমীতে আগমন, দশমীতে প্রত্যাগমন) শনি বা মঙ্গলবার হলে তিনি ঘোটকবাহিনী। ঘোটক অর্থাৎ ঘোড়া দ্রুতগামী এবং প্রায়শঃ অস্থিরমতি। অন্যদিকে মঙ্গল হলেন গ্রহ-সেনাপতি - তেজস্বী ও বীরদর্পী। আর শনি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বভাবত অনিষ্টকারী। সেই কারণে দেবীর ঘোটকবাহিনী হলে ফল ছত্রভঙ্গ - চরম বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষয়ক্ষতি। স্পষ্টতই, সিংহবাহিনী দেবীর আগমন-নির্গমন এর এই যানবাহনের কল্পনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের বন্দোবস্ত হবার বহুযুগ আগের সময়ে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করবার প্রচেষ্টা।

সে যেমনই হোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয় এবছর পুনেবাসী খুব ভালোভাবেই টের পেয়েছে। ১২ মাস, ৩৬৫ দিন জলকষ্টে জেরবার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের শহর পুনে। সেইখানে গত তিন মাসে কদিন সূর্যদেবের দেখা পাওয়া গেছে তা বোধ হয় হাতে গোনা যায়। বৃষ্টির প্রাবল্যে নালাসদৃশ মুলা-মুথা বইছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে। শহরতলী অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি। মাঝে মাঝেই প্রশাসন থেকে ইশকুল-কলেজ বন্ধ করবার জরুরী নির্দেশ। অন্যদিকে, এই কমাস আগে পর্যন্তও সারা দেশে - হা জল, যো জল অবস্থা। এমনকি দেশের কোন কোন অঞ্চলে জলবাহী ট্রেন পাঠিয়েও পরিস্থিতি সামলাতে হয়েছে। সারা পৃথিবীতে জল নিয়ে হাহাকার - তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাকি হবে জলের অধিকার নিয়েই। অথচ - এই জল, যার অন্য নাম জীবন - সে আমাদের পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ধন।

পৃথিবী এক আশ্চর্য গ্রহ। সৌরমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ অংশ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল যেখানে রয়েছে) মূলত শুকনো, জলের দেখা বড় একটা পাওয়া যায়না, পাবার কথাও নয়। জলের দেখা মেলে গ্রহাণুপুঞ্জের ওপারে - কারণ গ্রহাণু এবং ধূমকেতুগুলি জলের আধার। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবী সৃষ্টির আদিযুগে সৌরমণ্ডলের বাইরের অংশ থেকে ছিটকে এসে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল ***থেইয়া*** নামক গ্রহ। সম্ভবত এই থেইয়াই সঙ্গে এনেছিল আজকের পৃথিবীর জলের ভাণ্ডার। আর সেই ভয়ানক সংঘর্ষে ছিটকে যাওয়া টুকরো-টাকরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে তৈরি হয়েছিল পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ - যেখানে জলের উৎস সন্ধান করতেই চন্দ্রযান-২ এর যাত্রা। এই চাঁদের উপস্থিতির জন্যই পৃথিবী একদিকে হেলানো অবস্থায় স্থিতিসাম্য বজায় রেখে নিজের কক্ষপথে

সূর্যকে আবর্তন করতে পারে। সেই জন্যই আমরা পাই বার্ষিক ঋতুচক্রের আবর্তন। ঘুরে ঘুরে আসে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ... - ফিরে ফিরে আসে আমাদের উৎসব, এক পুজো থেকে আর এক পুজোয়।

সাম্প্রতিককালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হলেও আমরা এখনও মহাবিশ্বে অন্য কোন প্রাণ, অন্য কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পাইনি। মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে আমরা নিতান্ত একাকী যদি নাও হই, সঙ্গীর দেখা পাওয়া নিশ্চিতভাবেই সুদুর্লভ। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ও বিস্তার সত্যিই এক আশ্চর্য ঘটনা - ভক্ত ভাববেন দেবী মহিমা, বিজ্ঞানী বলবেন এ এক অদ্ভুত মহাজাগতিক সমাপতন। যেভাবেই দেখি না কেন - এই আশ্চর্য প্রাণের আধারকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাবার দায়িত্ব আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারিনা। তাই দেবীপক্ষে এইই হয়ে উঠুক আমাদের শপথ। হয়ে উঠুক ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিয়ে যাবার অভিজ্ঞান।

কারণ, নতুন প্রজন্ম চিন্তাশীল। তাদের মুখপত্র সদ্য-কিশোরীদের লেখায় দেখছি গভীর ভাবনার চিহ্ন। আর অবশ্যই রয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠদের লেখায় মধুর স্মৃতিরোমন্থন। আমাদের এই পত্রিকা আদৌ আলোর মুখ দেখতে পারবে কিনা এই সংশয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে আমরা সত্যিই এসে পৌঁছে গেলাম দ্বিতীয় সংখ্যায়। পশ্চিম পুনে বঙ্গীয় পরিষদের সকলের উৎসাহ আর সক্রিয় যোগদান ছাড়া সেটা কোনমতেই সম্ভব হত না। কনিষ্ঠ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ - সকলেই উৎসাহভরে লেখা-আঁকা পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে আশিস ধর এবং সন্দীপ মুন্সীর কথা বলতে হবে। আর আছে আমাদের স্পন্দন এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মী মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে মরাঠি হয়েও, যে নিষ্ঠা এবং অনায়াস দক্ষতায় মেঘনা (মূলত বাংলা পত্রিকার) সমস্ত গ্রন্থনার কাজটি প্রায় একা হাতে করেছে - সেও এক আশ্চর্য ঘটনা।

আগামী দিনগুলি সকলের আনন্দে কাটুক।

সুশান কোনার, স্পন্দন ২০১৯
(সম্পাদক - মণ্ডলীর পক্ষে)

সম্পাদনা - সুশান কোনার
গ্রন্থনা - মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস কুমার ধর
প্রচ্ছদ চিত্র - মঞ্জুষা গঙ্গোপাধ্যায়
অলংঙ্করণ - মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিবিধ (ইন্টারনেট) থেকে সংগৃহিত
সহায়তা - রাজ্যশ্রী পাল, সৌমিত্র মণ্ডল, অনিন্দ্য গোস্বামী
অনুপ্রেরণা - ড: অভিমন্যু সেনগুপ্ত, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সন্দীপ মুন্সী এবং পিপিবিপির সদস্যগণ

Ayush Das
11 years

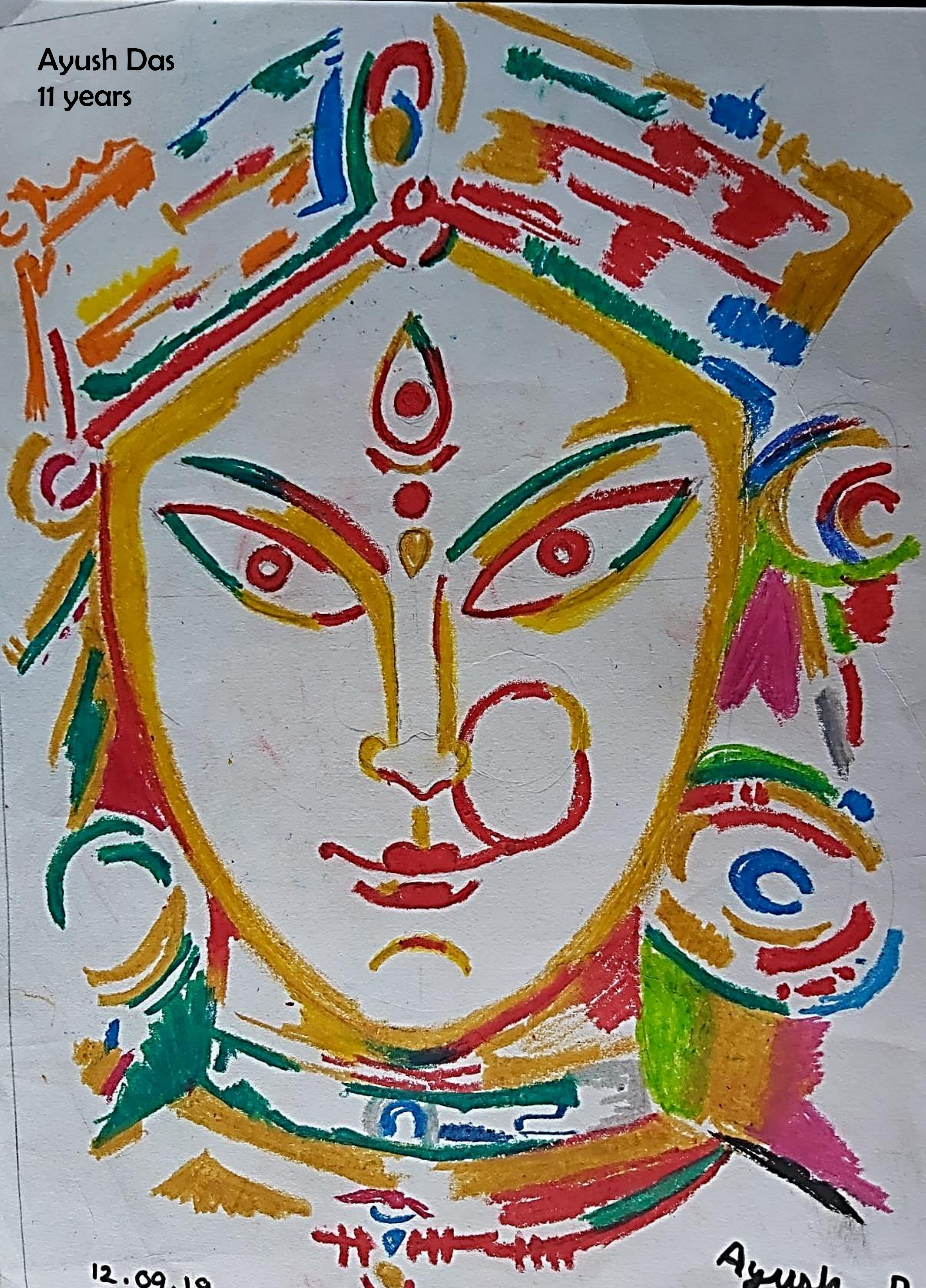

12.09.19

Ayush Das

অয়ি গিরিনন্দিনী*

শিবানী সেনগুপ্ত

যা চন্ডীমধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মুলিনী
যা ধূম্রেক্ষনচন্ডমুন্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তি: শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রীপরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ।।

যে চন্ডিকা মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী, মহিষাসুরমর্দিনী, ধুম্রলোচন – চন্ডমুন্ডাসুর - সংহারিনী, রক্তবীজ-ভক্ষয়ত্রী, শুম্ভনিশুম্ভাসুর - বিনাশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটি - সহচরী - পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।

' শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে' - কবির এই গানটিই শরতের ধ্বনি। এই গানের অনুরণনে... তার মূর্ছনায় এক আত্মস্থ ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। শরতের সোনালি ধানের ক্ষেত আর শিউলি- বিছানো অংগনে এক মহাশক্তির আগমনের উন্মাদনায় যে আত্মস্হভাব অনুভব করি, সেটাই আমাদের মহাপূজার প্রাণ।

এই মহাশক্তির আরাধনা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে প্রচলিত। পাঁচ হাজার বছরের আগেও পঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে দেবীপূজা প্রচলিত ছিল বলে অনুমিত। এই দুই নগরীর ধ্বংসাবশেষ - সিন্ধু নদের তীরে, অসংখ্য মৃণ্ময়ী দেবীমূর্তি প্রমান করে যে, এই দেবীই ছিলেন এখানকার অধিবাসীদের আরাধ্য প্রধান দেবতা। বৈদিক যুগেও শক্তিবাদ যে শুধু প্রচলিতই ছিল না, তা যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল - এটা প্রমাণ করে ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসুক্ত। এমনকি ঋগ্বেদে - বিশ্বদুর্গা, অগ্নিদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। এটি প্রভাতে ঋগ্বেদধারিনী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিনী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদধারিনী বৃদ্ধা।

আবার বেদোত্তর যুগের সাহিত্য থেকে জানা যায়, ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণ, যা ব্রহ্মের নিত্য- জ্ঞান- ইচ্ছা- ক্রিয়া, বহুভাবে বর্ণিত। এই জ্ঞান- ইচ্ছা- ক্রিয়াই - যেটাকে সৃজনশীল ভাবা যায়, সেটাই ব্রহ্মধর্ম। পরবর্তী কালেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতিতে দেখি - ' ব্রহ্মই কালী এবং কালীই ব্রহ্ম' ।এর কোন দ্বিমত নেই। দেবাসুর সংগ্রামে এই ব্রহ্মশক্তিদ্বারাই দেবতাদের বিজয় ও তাঁদের গৌরবের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। এই মহাশক্তিই বৈদিক যুগ থেকে ভারতে বন্দিতা হয়ে আসছেন। এই আদ্যাশক্তির ধ্যান করে অনাদি অনন্তকাল থেকে আমরা জীবনে সংহত হবার চেষ্টা করি।

শ্রীশ্রীচন্ডিকার ধ্যান স্মরন করি এই পর্যায়ে - আগমশাস্ত্রে বর্ণিতা এই মহাদেবীকে নিত্য উত্তমরূপে স্মরণ করি। -

ওঁ বন্ধূক- কুসুমাভাসাং পঞ্চমুন্ডাধিবাসিনীম্
স্ফুরচ্চন্দ্রকলা- রত্ন- মুকুটাং মুন্ডমালিনীম্ ।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং

পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ ।।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাস্নায় মানিতাম ।

দেবী- বন্ধুকপুষ্পবর্ণা ও শিরোপরিসংস্থিতা, উদীয়মানচন্দ্র, মুকুটরত্নরূপে শোভিতা, মুন্ড- মালা শোভিতা, উন্নতঘটসমকুচযুক্তা, ত্রিনয়না ও রক্তবসনা, পুস্তক, রুদ্রাক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারিনী - তাঁকে ধ্যান করি।

শ্রীশ্রীচন্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুর জীবের আত্মকেন্দ্রিকভাবের প্রতীক। নিখিল বিশ্বের সংগে একত্বের অনুভূতি ছাড়া এই আত্মকেন্দ্রিকতার বিনাশ হয়না। দেবী মহামায়া তার ধ্বংসের জন্য প্রলয়কালে সমুহ দৈবীতেজ দেবকূলের - আর তাঁদেরই দেওয়া বিভিন্ন আয়ুধ- অস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে, তাঁদের আকূল স্তুতিতে সাড়া দিয়ে, তিনি অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুলেছেন ভুবনখানি। ভয়ঙ্কর শব্দে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে আকাশ বাতাস। দেবতাদের প্রার্থনা দৈত্যকূলবধঅন্তে -

সর্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যা অখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্য মস্মদ্বৈরীবিনাশনম্ ।।

হে ত্রিভুনেশ্বরী, তুমি যেমন অসুরদলন করে ত্রিলোকের বিঘ্ননাশ করলে, এমনভাবেই সদা সর্বদা জগতের কল্যাণ সাধন কোর। দেবীও আশ্বাস দিয়ে বলছেন - যখনই তোমাদের দানবকৃত বিপদ আসবে, আমিও তখন অবতীর্ণ হ' য়ে তোমাদের শত্রুনাশ করবো।

আমরা সকলেই এই শক্তির পরিমন্ডলে বাস করছি। জগজ্জননী মা- সৃষ্টিতে আনন্দরূপা, স্থিতিতে পরমকরুণাময়ী রূপে তাঁর প্রকাশ। আবার প্রলয়কালে তিনি নিজ সৃষ্টি নিজ হাতে ধ্বংস করেন। চন্ডীতে তাই বলা হয়েছে - তাঁর চিত্তে কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা একই সংগে খেলা করছে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে এসে আমরা দেখি, দশপ্রহরণধারিনী শক্তিময়ী মা, আমাদের ঘরের মায়ের সংগে একসূত্রে বাঁধা হয়ে রয়েছেন। সংসারে, প্রয়োজনবোধে রাগাণ্বিত আমাদের মা- ও রাগ প্রশমিত হলে, সন্তান- বাৎসল্যে স্নেহ বিলিয়ে আমাদেরই বিপদমুক্ত করেন।

এই মানবতার সুরে, বর্ষকাল সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মর্তের মায়েরা, কন্যায় রূপান্তরিত জগজ্জননী মাকে, ব্যাকুল আহ্বান জানান কৈলাস শিখর থেকে। বাংলায় গ্রামে এই সময় মন- মুক্ত করা কত বাউল- ভক্তদের আগমনী গানে এই আর্তি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। মা - মেনকার এই আকুলতা দেখি এই আগমনী গানে -

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা নাকি বড় দু:খে রয়েছে।
দেখেছি স্বপন- নারদ- বচন
উমা ' মা' ' মা' বলে কেঁদেছে।।

অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে মায়ের এই ব্যাকুলতা সত্যিই আমাদের সকলের মন ছুঁয়ে যায়। মাত্র চারটিদিনের জন্য গৌরী স্বামী- সন্তান আর বাহনসহ আসছেন। মায়ের মনে সীমাহীন আনন্দ এই স্নেহের পুতলিকে কিভাবে যে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেবেন, তারই কল্পনা এই মুহূর্তে। বরণ- উৎসবের আয়োজন চলছে। মা জননী তাঁর আপনমনের মাধুরী দিয়ে বিবিধ বস্ত্রসম্ভার, অলংকার, চন্দন, সিঁদুর ও অপর্যাপ্ত ফুলে মালায় সাজিয়ে দিয়েছেন। তার পরম স্নেহের ধনকে তাঁরই পছন্দমত খাদ্যবস্তু সাজানো সামনে। তারপর, সবই তাঁর পায়ে অর্পন করে, তাঁকে নানা উপাদানে আরতি ক' রে - নৃত্যের মধ্য দিয়ে, আনন্দ- সাগরে সবাই মেতে উঠেছে। অবাক বিস্ময়ে, এই তাঁর

বুকের ধন - স্বর্গীয়া দুলালীর দিকে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন মা। বিয়োগের ভাবনা, এখন তাঁর অভাবনা - তবু মনে পড়লো আরেকটি আগমনী গান -

বলে বলুক লোকে মন্দ

এবার উমা এলে,

আর উমায় পাঠাবো না ।।

মুহূর্তে যেন করুন সুরের মাঝে বিজয়াদশমীর সকাল আগত। বিদায়- ব্যথায় তার বরণসমারম্ভ চোখের জলে। তাঁকে আলতা- সিঁদুর পরিয়ে মুখে পান মিষ্টি দিয়ে যাত্রা প্রস্তুত। মুহূর্ত- পূর্বের আনন্দিনী - মায়ের স্নেহের নন্দিনীকে আদরে বিদায় দেবার যে বেদনা, তা সংসারে প্রতিটি মা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন।

আজ একুশশতকের মহাপূজা। চারিদিকে নয়নমেলে তাকিয়ে দেখি - জগৎজোড়া অশান্ত অবস্থা। শুভাশুভের মন্থনে, বিচিত্র সমাজ একরাশ সংশয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোনও এক আসুরী শক্তি আজ মানুষকে বিপথে পরিচালিত ক' রে বিপর্যস্ত করে তুলছে। আগ্রাসী আকাঙখার কবলে মানুষ আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট, অস্থির, উদভ্রান্ত এবং বাস্তবিকই বিভ্রান্ত। সমাজে যেন স্থিতিশীলতা হারিয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের মনকে সংহত করার একান্ত প্রয়োজন। উপনিষদে বর্ণিত ‘ শান্তোহয়ম আত্মা’ - এই মন্ত্রে মানুষ তার মনোজগতের সমস্ত জটিলতার ধীরে ধীরে সমাধান লাভ করে। এটাই গভীরতম মানবতাবাদ। এর মধ্যে আছে প্রশস্ত সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা - যা স্থায়ী ও দৃঢ় এবং পরিবেশের সঙ্কীর্ণ চাপের নাগালের বাইরে। এই সব কারণে আমাদের দুর্গাপূজার সার্থকতা কেবল পূজারূপে নয়, এই পূজাকে কেন্দ্র করে সমাজে সকলের সমাবেশে যে উৎসব হয়, তার কেন্দ্রবিন্দুরূপে।

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে মাগো, তোমাকে আবাহন করি। তুমি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে - যে আসুরী শক্তি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে তার বিনাশ করো আর ' শতাক্ষী' রূপে এসে মানবিকতার এই গ্লানি দূর করো। আমাদের প্রার্থনা, অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে, তোমার কাছে - তোমার দেওয়া রূপ, জয়, যশ, ইত্যাদির সংগেও - আমাদের যে মূল ধর্ম, সততা, অপরের প্রতি ভালবাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ত্যাগ, সেবা, আজ্ঞাবহতা, পবিত্রতা, কর্তব্যবুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে, যেন তোমারই আদর্শে ও নির্দেশে সেবাব্রতে ব্রতী হতে পারি। আর তোমারই মত মানসিক দৃঢ়তা লাভ করে, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের যোগ্য সন্তান হতে পারি।

মহালয়ার পুণ্য প্রভাত সমাগত। পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদে আমাদের ভাইবোনেরা - তাদের অপর্যাপ্ত আনন্দ- উৎসাহে সৃজনশীল হয়ে সাজিয়েছে তাদের পূজার ডালি - শারদীয়া পত্রিকার মাধ্যমে এটা পরিবেশিত হচ্ছে। এই E-journal এর প্রথম সংখ্যার যাত্রা আজ শুরু। সকলের পারস্পরিক ভাবনাচিন্তার বিনিময়ে এর মূল্য অপরিসীম। বাস্তবিক, সদস্যদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে এটা একটা বিরাট সেতু। এছাড়া, এই প্রকল্পের মাধ্যমে, বর্তমান প্রজন্মকে, যার যেটুকু সাধ্য, সেইটুকু অবদান করাতে উৎসাহিত করাতে পারলে, আমার মনে হয়, এর সার্থকতার মান আরও উন্নত হবে। একে অন্যের সংগে সম্পর্কস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই স্বত:স্ফূর্ত আনন্দমেলা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

দৃপ্ত পদক্ষেপে এর অগ্রগতির জন্য, মাগো, তোমার শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করি - :

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ

প্রসীদ মাতোর্জগতোহখিলস্য ।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম্।
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ।।

হে অখিল জগতের জননী, সমগ্র চরাচরের দেবী বিশ্বেশ্বরী, এই বিশ্বকে তুমি রক্ষা করো ও আমাদের প্রতি প্রসন্না হও।।

Sivani Sengupta, a Sanskrit scholar from the University of Calcutta and a Ph.D in Library & Information Science from the SPPU (formerly University of Poona), from where she retired as a faculty member in 1997. An avid follower of Bangla literature, she has been teaching Bangla at Surajhankar since its inception. She has been actively involved in various cultural activities in Pune, especially in the field of children's theater since the past five decades.

* প্রথম সংখ্যা থেকে পুনঃ প্রকাশিত

বেঁচে আছি

অনিন্দ্য গোস্বামী

চলে গেছে তো অনেকদিন নিজের কথা ভেবে,
নিজের জন্যে বেঁচে আছি এক শতাব্দী কাল।
বাঁচবো কেন এই প্রশ্ন মাথায় যদি আসে-
তর্কের আর জটিল বলে সরিয়ে রাখি পাশে।
বেঁচে আছি সে কথাটাই সবার চেয়ে বড়ো,
ইচ্ছে আছে বাঁচবো আমি যদিন পারি আরো।

প্রশ্ন করছো, জন্ম কবে? তবে খুলেই বলি।
আমার জন্ম রামমোহনের স্বপ্ন মাখা চোখে,
জন্মেছিলাম শিলার উপর বিবেকানন্দ রকে,
এমন ভাবেই জন্ম আমার সারা ভারত জুড়ে।

আমার বাবা সেতো বাপু! কবেই গন ফট।
কিছু একটা বলেছিলেন, বয়েস কালে লোকে
অমন কথা বলেই থাকেন, কান পাতিনা তাতে ।
পাততে হলে পাতি কান এফ এম চ্যানেলে,
জানতে পারি আমার ভারত কেমন গৌরবে-
হারিয়ে আসে বিদেশীদের ক্রিকেট খেলার মাঠে ।
এই ভাবেই বাঁচতে হয়, একেই বলে বাঁচা।

এসব ছাড়া 'আমি' কোথায়? বাকি তো দুর্নীতি ।

ছন্দ যেমন বিগড়ে গেলো, তেমনি আমার হাল ।
হাল টানছে শুয়োর, আর খোয়াড়ে ওঠে চাল ।
চালছি আমি ঘুঁটি, যার সব পিঠেতেই ছয়।
ছয়ের কথায় ছয় ফেলেছি, ছয়ের হলো জয় ।

জিতলোই বা কি আর তাতে? ওরা আমার দোসোর ।
দেখছনা কি এই পৃথিবী একটি প্রিজম জবর?
নিন্দুকেরা বলতে পারে "হারটা হলো কার?"
বলবো আমি "হেরেই আছি, লজ্জা তো নেই আর” ।

ওই প্রিজমে সবাই যেমন হচ্ছে ভেঙে ছয়,
আমিও তেমন ছক্কা ভিতর ।আমার জন্যে নয়-
ছয়ের জন্যে বেঁচে আছি । বাঁচতে গেলে তবু
ভাবা উচিৎ দশের কথা, শিখিয়েছিলেন বাপু।

Anindya Goswami is an associate professor of Mathematics in IISER Pune. He was born in Sodepur, a suburb of Kolkata in 1980. Presently he stays in Pune with his wife and daughter. Apart from his research and teaching mathematics, he also enjoys writing poems in Bengali.

Shoumitree Gupta
Standard III
Sri Sri Ravishankar
Vidya Mandir

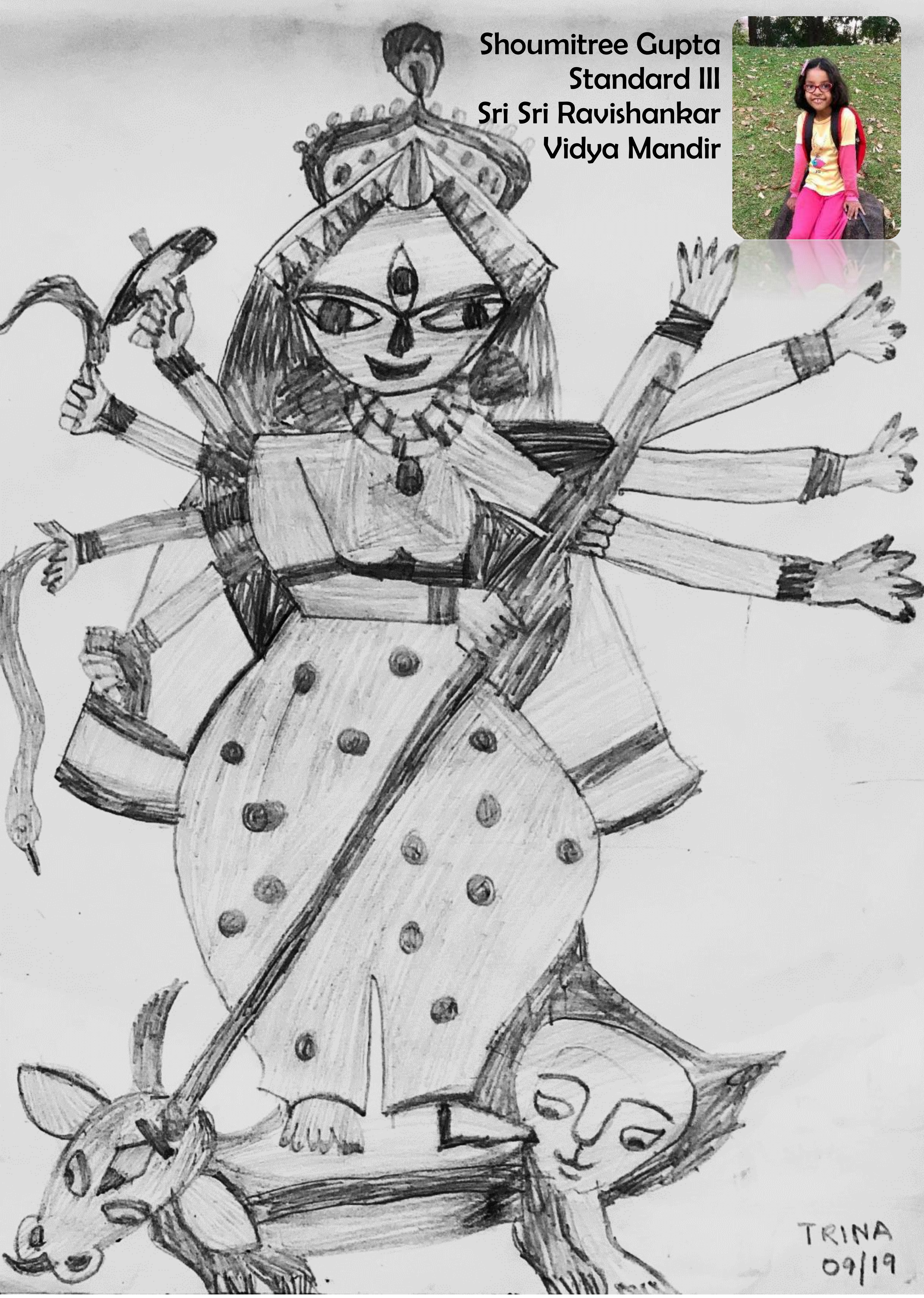

During Durga Puja This Weekend

Swati Shome

It's Durga Puja this weekend.
We will have to go to church
And set up the metal folding chairs,
Tables for food etc.

I wonder if any parent will bring a
Movie like Dumbo for us kids to watch.
Last year there was a
Projector in the corner room of the
Second floor of the church.

It's Durga Puja this weekend.
Of course, in India, it got over weeks ago.
For us Durga Puja is always on
Friday, Saturday and Sunday.

Ma will make Sandesh 400 of them
For our members to eat.
Last year she made 600 of them.
Baba says our Durga Puja group
Has quarrelled yet again and split into two.
Why do we Bengalis quarrel so much?

Don't eat with your left hand.
It's Prasad. To be eaten with the right.
What about Bobby?
He is a lefty. Is he supposed to
Lift the food with his right or left?

We have to go stand
With the others in front.
Put your hands together.
It's Anjali.
Who? Where is she?
Not a person, silly.
This standing with flowers
In hand, repeating strange sounds,
This is Anjali.

Then we have to sit patiently
In front and watch the elders
Wear strange clothes and
Sing and prance around the stage
Keep quiet. Otherwise you will get yelled at.
Let's play one potato, two potato silently.

I am wearing gold! Real gold!
Ma let me wear it.
Can't believe it.
I am like a princess.
Everyone is looking at me.

Everyone is laughing at the people on stage
Wonder why. This new dress is kind of scratchy
But is OK.
Aunties are praising me
Because I agreed to wear such a strange costume.

The dancing, the prancing
The lines of people on stage
Swaying their heads while singing
Has ended.
Durga Puja is over.

We help put the chairs in the back of the church,
While our parents clear the tables.
Now is the best part of Durga Puja.
We kids sweep the church with huge dry mops.
And crash into each other
Kaboom! The dirt has spread all over again
This is more fun than even bumper cars!

Yeah, we are Bengalis.
Our moms wear saris and
Red nail polish dots on their foreheads.
We will have to wait another year
For our bumper mop crashes
Wait another year
Till we celebrate Durga Puja again.

[**Swati Shome** grew up in the USA, where Durga Puja was often held in church premises.]

পুজো পরিক্রমা*

জোনাকি ভট্টাচার্য

আমরা বাঙ্গালীরা, প্রচণ্ড হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, থিয়েটার-নাটক, ঘোরা-বেড়ানো - এই সবই ভালোবাসি। এসবই আমাদের মজ্জাগত। এক কাপ চা নিয়ে বেশ ক ঘণ্টা আড্ডায় মশগুল থাকা বোধ হয় আমাদের মতো কেউ পারেনা। আর এসবে ছোট বড়, ছেলে মেয়ে, বাচ্চা বুড়ো, সবাই ভীষণ আনন্দ পায়, খুব উপভোগ করে। পুজো আসার বেশ কমাস আগে থেকেই, ঘরে ঘরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা দেখা দেয়। সব জায়গায়, সবার সঙ্গে, শুধু একই কথা - পুজোর সময় কে কি পরবে, কোথা থেকে কেনাকাটা করা হবে, কোনটা নতুন ফ্যাশন, কে কোন প্যান্ডেলে যাবে, কোথায় ভালো খাবার স্টল হয়, কোথায় ভোগ খাওয়া হবে ইত্যাদি।

আমি পুরোপুরি প্রবাসী, একেবারে ১০০ ভাগ। জন্ম, বড় হওয়া, লেখা-পড়া, নাচ-গান, থিয়েটার, বিয়ে - সবই দিল্লীতে। তারপর নানান জায়গা ঘুরে, গত ৪৫ বছর ধরে পুণায়। জন্ম থেকে দিল্লীর পুজোর সঙ্গে জড়িত, মা-বাবার সঙ্গে। সকাল-সন্ধ্যে পুজোর সময় উপস্থিত থাকাটাই তখন আসল উদ্দেশ্য ছিল। রাত্রে বাবা মা stage performance করতেন। মা খুব ভাল গান গাইতেন, আর বাবা হারমোনিয়াম, এস্রাজ, তবলা বাজিয়ে সঙ্গত করতেন। সে এক অপূর্ব স্মৃতি। তখন এতো জামাকাপড়ের বাহার ছিল না, আর আমরা বাচ্চারা কি চাই, কি চাইনা অত বুঝতাম না। বেশ কটা নতুন ফ্রক হতো, আর বাটার জুতো। জামাকাপড় সবই মা পছন্দ করতেন, ওনার কথামতো সেলাই হতো, আর আমরা ভীষণ খুশী হয়ে পরে গর্বিত ভাবে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়াতাম। থিয়েটার, নাটক, সিনেমা সবই দেখতাম, প্যান্ডেলে খাওয়াদাওয়া করতাম। তাতে কোনদিন কোনও শ্রীর খারাপ হয়নি, অথবা লেখাপড়ার ক্ষতি হয় নি। অবশ্য তখন পুজোর সময় পরীক্ষাও থাকত না, আর এতো প্রতিযোগিতাও ছিল না। দিল্লীতে তখনও বেশ কটা পুজো হত। তাই pandal hopping এর হাতেখড়ি খুব অল্প বয়সেই হয়েছে। কোন দিন কোথায় যাওয়া হবে, বাবা আগেই বলে দিতেন, আর পাড়া প্রতিবেশীর বাচ্চারাও আমাদের সঙ্গেই যেত।

বিয়ের পর নিজের জীবনেও পুজোর সময় চুটিয়ে আনন্দ করেছি, ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে, স্টল এ রান্না করা, হৈ হৈ করে খাবার বিক্রী করা, থিয়েটার, নানান প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া - সব করেছি। বহু পুরস্কার ও পেয়েছি। ছেলেরাও এসবের মধ্যে দিব্যি ভাল ভাবে বড় হয়েছে। ওরাও আবৃত্তি, fancy dress, বাচ্চাদের থিয়েটার - সবই করেছে। সবাই প্রায় দিন রাত প্যান্ডেলেই থাকতাম। তখন সারা রাত বাংলা সিনেমা হত, সবাই বসে দেখতাম। সঙ্গে প্যান্ডেলের নানান খাবার, বিশেষ করে ভীষণ মিষ্টি চা। আমাদের প্রবাসীদের সম্বন্ধে অনেকের নানান রকম ভুল ধারণা থাকে। আমরা বাংলা জানিনা, বাংলা রান্না করতে পারি না, (আমার বাড়ি এসে দেখুন!), বাংলা সাহিত্য, গান, বাজনা, থিয়েটার, নাটক বুঝি না। কিন্তু একটু মিশে দেখলেই এইসব ধারণা পালটে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বাংলার বাইরে, তাই এসবের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, খুব উপভোগ করি, আর কোনও সুযোগ ছাড়ি না।

এখনকার পুজো, একেবারেই অন্য রকম, অনেক কিছুই পালটে গেছে, কিন্তু যেটা পালটায় নি সেটা হল হৈ হৈ, তোড়জোড় করে পুজোর জন্য তৈরি হওয়া। শাড়ী, ব্লাউস, ঘাগরা, জিনস, ছেলেদেরও পোশাকের বাহার - সবই অত্যাধুনিক, সিনেমার তারকাদের থেকে নেওয়া ফ্যাশন। আর অনেক মাস আগে থাকতেই ছুটোছুটি আরম্ভ হয়, কিন্তু তবুও পুজোর দিন এগিয়ে আসলে, চারিদিকে শোনা যায় - লাল ব্লাউসটা তৈরি হয়নি, জুতো কিনতে হবে, ম্যাচ করছে না, দরজিরা কাজ নিতে চাইছে না, কি ভীষণ চিন্তা। বাজার-হাট, সিনেমা-মল - কোথাও গেলেই বাংলা কথা শুনতে পাই, সব জায়গায় বাঙ্গালী ভীষণ ব্যাস্ত হয়ে নিজেদের সব প্রস্তুতি করছে। এতো বাঙ্গালী পুণায় আছে? সারা বছর এরা কোথায় থাকে? আরে বাবা, সারা বছর আর দুর্গা পুজোর মধ্যে তফাত আছে না? আগে পুণায় বাংলা খাবার-দাবার, ভাল মিষ্টি পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন বহু জায়গায় নানান বাঙ্গালি খাবার পাওয়া যায়, প্রচুর মিষ্টি, আর সব জায়গায় পুজোর জন্য special buffet. কিন্তু যতোই হোক না কেন, পুজো প্যান্ডেলের মজা অন্য কোথাও পাওয়া জায় না। তাই ওই কটা দিন সবাই সকাল থেকে প্যান্ডেলে যাবার জন্য ব্যাস্ত হয়ে পড়ে।

কোনও রকমে সংসার সামলে, সোজা প্যান্ডেল। আর ওই মিষ্টি চা, আর ছোট ছোট সিঙ্গাড়া নিয়ে আড্ডা। "কি বৌদি, কেমন আছেন" শুনলেই ভেতরটা আনন্দে ভরে যায়।

ভগবানের দয়ায়, আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় দুর্গা পুজোর আনন্দ উপভোগ করেছি। বিদেশে প্রথাটা অন্য রকম হলেও ভাল লেগেছে। ওখানে সবার সুবিধে দেখে, সপ্তাহান্তে এ পুজো করা হয়। শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবার দুপুরের মধ্যে সব শেষ করতে হয়। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, মোটা কোট, জুতোমোজা পরে পৌঁছে তারপর সব বাইরে খুলে ভেতরে যেতে হয়। ভেতরে কিন্তু পুজোর আনন্দ হৈ হুল্লোড় সরগরম। অপূর্ব সুন্দর সুন্দর নানান রকম বাংলার শাড়ি, দারুণ চোখ ধাঁধান ধুতি পাঞ্জাবী। বড়রা, বাচ্চারা সবাই এই দিনগুলোর আনন্দে মশগুল। কিছু কিন্তু বাদ ও যায় না। খুব ভাল ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো, সন্ধ্যারতি হয়, হৈ হৈ করে সবাই মিলে ভোগ খাওয়া হয়, অনুষ্ঠান হয়। সবাই মহানন্দে যোগ দেয়। বেশির ভাগ যখন ছুটিতে কলকাতা যায়, সব থেকে বড় কাজ হল পুজোর বাজার। প্রচুর সময় নিয়ে, নানান জায়গা ঘুরে, হাল ফ্যাশনের সব কেনাকাটা করে কলকাতার বিখ্যাত street food খেয়ে খুশী হয়ে বাড়ি ফেরা। সবার একটাই উদ্দেশ্য - পুজোর আনন্দ।

পুণায় বহু বছর হয়ে গেল, কিন্তু পুজোর সময় প্যান্ডেলে গিয়ে হৈ চৈ করাটা একটুও কমেনি। সত্যি বলতে কি, এই সব ব্যাপার আমার মতো কেউ পারবে কি না সন্দেহ। প্রচুর pandal hopping করি - গত বছর কুড়িটা পুজোয় গিয়েছিলাম, এবছর বেশী না করলে চলবে? প্রতি বছর প্যান্ডেলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, শুনছি এ বছর নাকি চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছবে। সব জায়গায় প্রচুর লোক, নানান অনুষ্ঠান, আড্ডা, মজা, খাওয়া-দাওয়া, সব নিয়ে সত্যি এক অপূর্ব আন্নদের পরিবেশ। "এই তো বৌদি এসেছেন" শুনলেই কি ভালো লাগে।বহু পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, আনন্দের কোলাহলে মাঝখানের বছরগুলো কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনা।

তবে এখন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে পুজো একেবারে আধুনিক ভাবে পরিচালনা করা হয়। সব কিছুই অনলাইন হয়ে যায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলা প্রায় উঠেই গেছে। সবাই বাড়িতে বসেই চাঁদা পাঠিয়ে দেয়। এখন আর ধাক্কা খেয়ে, দোকানে দোকানে ঘুরে বাজার না করলেও চলে, অনলাইন এই পছন্দসই সব কিছু বাড়িতে চলে আসে। কোনটা ফ্যাশন দেখে নিয়ে শাড়ি, জিনস, ঘাগরা, - পছন্দ করে অর্ডার দিলেই কদিনের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। তবে ফ্যাশন যাই বলুক, শাড়ি হল পুজো প্যান্ডেলের বাহার। কলকাতা থেকে আনা, নানান রকম শাড়ি পরে, মহিলারা দারুণ গর্বিত ভাবে ঘুরে বেড়ান, এবং অল্প বয়সী মেয়েদেরও সেটাই পছন্দ। আর ছেলেরা কি পিছিয়ে থাকতে পারে? কক্ষনই না। তাদের জামাকাপড়ের বাহারও চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতন, প্রত্যেক প্যান্ডেলে ছোট ছোট দল করে জমজমাট গল্প, আড্ডা চলে। সঙ্গে লুচিমাংস, সিঙ্গাড়া, চপ, মাছের ফ্রাই, মিষ্টি, বিরিয়ানি, কিছুই বাদ যায় না। পুজোর সময় কেউ ডায়েট করেনা।

কিন্তু আমি প্রাচীনপন্থী । অনলাইন কিছুই করি না। দশটা দোকানে গিয়ে পছন্দ করবো, গরমে ধাক্কা খাবো, দরাদরি করে দাম কমাবো, সব করে, সব নিয়ে দরজির কাছে যাব, তাকে বকাবকি করে সেলাই করাব - এসব না করলে পুজোর আমেজটাই আসেনা। তারপর রোজ সকাল বিকেল নানান জায়গায় গিয়ে খেয়ে দেয়ে আড্ডা হৈ চৈ ধুনুচি নাচ, সব করে, প্রচণ্ড হৈ হুল্লোড় করে পুজোর দিনগুলো আনন্দে ভরে নেব।

Jonaki Bhattacharya has been born, brought up, educated (Arts graduate from Miranda House) and married in Delhi and then lived in different parts of India; the last 45 years being in Pune. She is interested in every aspect of life and lives it on her own terms with great style!

* প্রথম সংস্করণ থেকে পুনঃ প্রকাশিত

উল্টো রথ

অমিয় ষড়ঙ্গী

সাঙ্গ করে মাসির বাড়ির
আদর, খাওয়া দাওয়া
যাচ্ছ ছেড়ে তাড়া আছে
এখন বাড়ি যাওয়ার।
বেশ কাটলো এই কটা দিন
তোমার সাথে সাথে
ওঠ বোস আর গল্প গুজব
মজার খেলায় মেতে।
যাবার সময় পরান কাঁদে
ভাসবো চোখের জলে

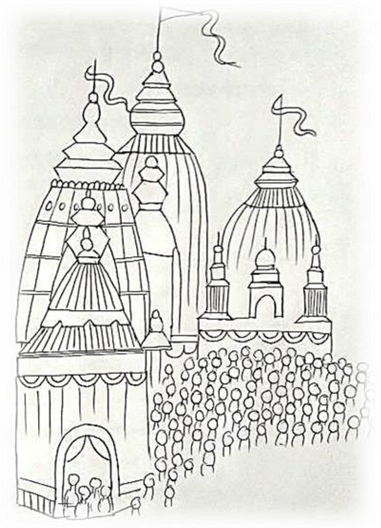

কাটিয়ে দেব একটি বছর
তোমার কথা বলে।
আবার তুমি আসবে প্রভু
মাতবে জগৎ লীলায়
ধন্য হব তোমার সেবায়
তোমার চরণ ছোঁয়ায়।
সাজবে যে রথ বাজবে যে ঢাক
বইবে আষাঢ় হাওয়া
মিলন হবে উজাড় করা
ভক্ত প্রানের চাওয়া।

শান্তিনিকেতন এবং আই আই টি খড়্গাপুরের প্রাক্তনী **ডঃ অমিয় ষড়ঙ্গী** প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সৈন্য বিষ্ফোটক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিজ্ঞানী। কর্মজীবনে তিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং ধাতু ও বিস্ফোটক নির্দেশালয়ের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহন করেন। দেশে এবং বিদেশে ভ্রমন করা, কবিতা পড়া কিংবা শোনা তাঁর শখের বিষয় আর কবিতা লেখাটা নিতান্তই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য।

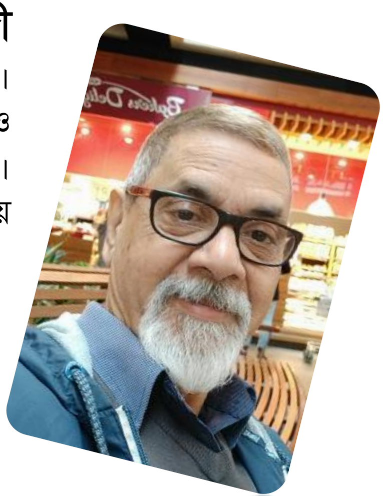

Tista Bandyopadhyay
Class V,
Vidya Valley School

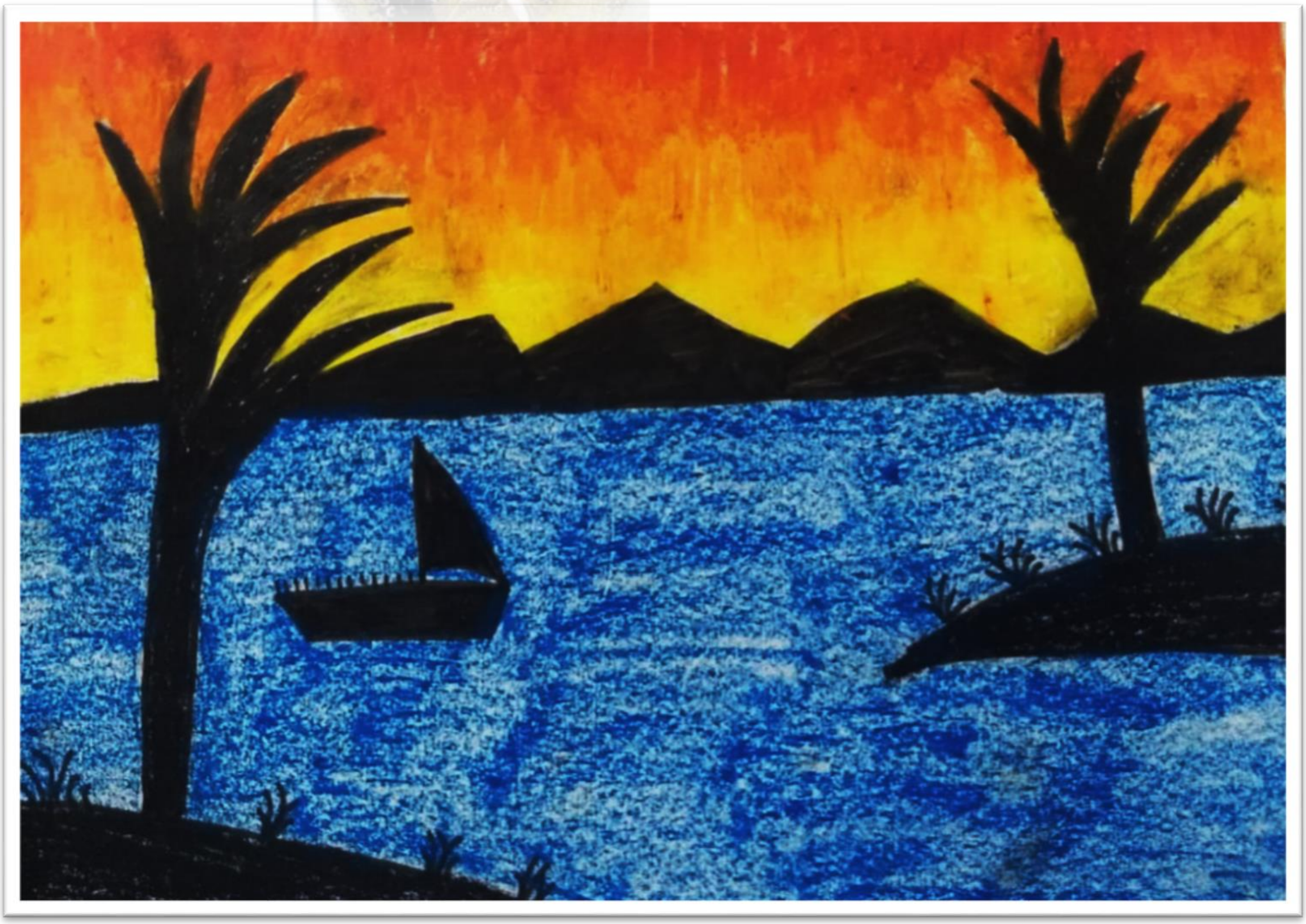

অমানবিক

ঋতুপর্ণা মুখার্জি

দিনরাত অসংখ্য সাপ
ঘোরাফেরা করে আনাচে কানাচে,
মাকড়সারা জাল বোনে
লালা নিঃসৃত হয় শিকার দেখে
পৃথিবীর সব শিশু যদি যীশু হত...

ভুল হয়ে যেত সব ভবিষ্যদ্বাণী
সব শবদাহ সম্পন্ন আজ ।
ছিন্নমস্ত শয়তানেরা
অদ্ভুতভাবে হৃদয়হীন -

আতঙ্ক ভরা সমুদ্রের ঢেউ
আছড়ে পড়ছে আগুনের বুকে
উলঙ্গ রাজা দেখে কেউ আর হাসে না,
আবরণহীনতাই পরিচয় আজ ----

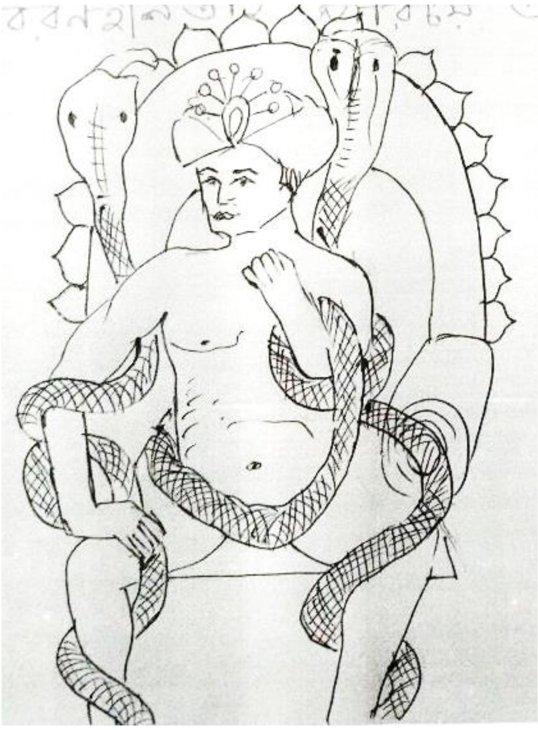

Rituparna Mukherjee is a teacher by profession. Writing and dancing are her passions. She has been with PPBP for last 5 years.

সিলেটের দুর্গাপুজো এবং এক ভোজন রসিকের আক্ষেপ*

ড: মলয় দত্ত চৌধুরী

আমার ছেলেবেলা মানে ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত কেটেছে গ্রামের বাড়িতে। গ্রামের নাম শ্রীগৌরী। সিলেট বাঙ্গালী অধ্যুষিত এক প্রান্তিক বাসভূমি বরাক ভ্যালি উপত্যকার কাছাড় জেলার অন্তর্গত এই গ্রামটি। শ্রীগৌরী গ্রামে আছে শ্রীগৌরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় - ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি আমাদের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে পনেরো মিনিটের পথ। আমাদের বাড়ি থেকে দৌড়ে দুমিনিটে রেলস্টেশন "রূপসীবাড়ি"। অন্যদিকে দুমিনিট দূরে বাস চলাচলের জন্য Trunk road যেটা চলেছে স্টীমারবাহী বরাক নদীর পাশ বেয়ে। পড়াশোনা ও যাতায়াতের উপর কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদা ও তেনার সাঙ্গপাঙ্গ যে ভাবতে অবাক হতে হয়। ম্যাট্রিকুলেশনের পর আমার পড়াশোনা, দশ মাইল দূরে মহকুমা শহর করিমগঞ্জে। এই এলাকার একদিকে পূর্ববঙ্গ, একদিকে ত্রিপুরা রাজ্য। অন্যদিকে সোয়াশো মাইলের পাহাড়ী রেলরাস্তা ধরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লামডিঙ হয়ে গৌহাটি অথবা বাস ধরে শিলং হয়ে গৌহাটি। এই সব রাস্তার বিশেষ করে রেলরাস্তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার ভাষায় দুরূহ।

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা নদীর পাশ দিয়ে রেলরাস্তা। ছত্রিশটা টানেল। পাহাড়ে অতি সুস্বাদু কমলালেবু আনারস আর মৌমাছির ঝাঁকেদের প্রাচুর্য। মাঝেমাঝে বুনো হাতির দল এসে যখন রেললাইন দখল করে তখন তেমনি ভয়ঙ্কর।

সব মিলিয়ে জীবনের প্রথম কুড়ি বছর - মানে স্নাতক পর্যন্ত আমার কেটেছে শ্রীগৌরী ও করিমগঞ্জে। ওই এলাকার লোকেরা পড়াশোনা, চলাফেরা ইত্যাদিতে যেমন খুবই উন্নত চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ছিল, তেমনি ওরা গুরুত্ব দিত ধর্মাচরণ, পল্লীগীতি রচনা, ভাল ভাল পুরানো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে। ওখানকার দুর্গাপুজোর সময়টা আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সময়। একমাস স্কুল কলেজের ছুটি। তাই পুজোর কিছুই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল না। ওখানকার পুজো ছিল প্রবাসে বিশেষ করে পুনা শহরের পুজোর থেকে অনেক ব্যাপারেই অন্যরকম। ওখানকার লোকেরা যেকোনো সুখে দুঃখে মানত রাখত পুজোয় পাঁঠাবলি দিয়ে।

বাড়ীর পুজো হোক বা বারোয়ারি পুজো, অথবা কালীবাড়ি বা রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো, প্রত্যেক পুজোতে প্রত্যেকদিন বেশ কয়েকটা পাঁঠাবলি হতো। মন্ত্র করে মায়ের কাছে পাঁঠাবলি দিতেন পুজোর প্রধান পুরোহিতমশাই নিজে। বলির পর পাঁঠার মাথার অংশটা নিয়ে যেতেন পুরোহিতমশাই, দেহটা থাকত উৎসর্গ করার জন্য। সেই পাঁঠার দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে সেটা রান্না হতো আর উপস্থিত ভক্তরা ও গ্রামবাসীরা প্রত্যেকদিন প্রসাদ পেত পেটভরা মাংসভাত। পুরোহিতমশাই যিনি মাথার ভাগ পেতেন তিনি সাধারণত এত প্রতিভাসম্পন্ন হতেন যে পাঁঠার গলার

পুরোটাই চলে যেত মাথার দিকে, যাতে মাথার অংশটায় মাংস যতটা সম্ভব বেশী পাওয়া যায়।

আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই আমাদের পুরোহিতমশাইয়ের বাড়ী। ইংরাজী ভালো করে জানা তর্করত্ন উপাধি পাওয়া অতি সুপুরুষ এই পুরোহিতমশাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন। তিনি পুজোর সময় প্রায় প্রত্যেকদিন কুড়ি পঁচিশটা করে পাঁঠার মাথা পেতেন তার থেকে বেশ কয়েকটা অন্য পুরোহিতদের দিয়ে প্রত্যেকদিনই ডজন খানেক মাথা দিয়ে বাড়ী ফিরতেন। ফেরার পথেই আমার ডাক পড়ত ওনার বাড়ী যাওয়ার জন্য। আমি সেই সব চামড়া ও শিং সহ মাথাগুলো থেকে মাংস বের করে কেটে কেটে রান্নার উপযোগী করে দিতে দিতে রীতিমত পারদর্শী ছিলাম। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পুরোহিতমশাইয়ের ছেলেমেয়েদের সাহায্য নিয়ে রান্নার উপযোগী মাংস বানিয়ে তার কিছুটা ওদের বাড়ীতে দিয়ে বাকিটা নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। পুজোর প্রসাদ, তাই বাড়ীতে আমার এই সব কাজকর্ম নিয়ে বেশী গালিগালাজ শুনতে হতো না। গ্রামের বাড়ীতে খাবার ঠান্ডা করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। তাই সেগুলো সেদিনই রান্না করে নিতে হতো। অর্থাৎ পুজোর কয়েকদিন আমরা প্রচুর পরিমাণে মাংস খাওয়ার সুযোগ পেতাম। আমার মত ভোজন রসিকের কাছে সেটা যে কী প্রাপ্তি ছিল সেটা মনে হলেই এখনো মনটা আক্ষেপে ভরে ওঠে। এছাড়াও প্রায় প্রত্যেকদিন দুপুরে পুজোবাড়ী গুলো থেকে নেমন্তন্ন আসত দুপুরে খাওয়ার জন্য। খাবার হিসেবে থাকত প্রচুর মাংসসহ ভাত। তারপর চাটনী ও সবশেষে পরমান্ন। মাংস ভাত ও পরমান্ন প্রত্যেকদিন, আর চাটনীরই শুধু হতো রকমফের। আনারস, চালতা, আমড়া ও জলপাই দিয়ে চাটনী থাকতো বিভিন্ন দিনে।

প্রবাসে বিশেষ করে পুনা শহরে, পুজোর দুপুরে খাওয়া মানেই খিচুড়ি। আমিষ খাবার নৈব নৈব চ। সন্ধেবেলা খাবারের স্টলগুলোতে মাংসভাত অথবা আমিষ চপ কাটলেট নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে খাওয়ার কিছুটা সুযোগ আছে। এবং সেটাই পুজোর কয়েকদিন মাংস খাওয়ার একমাত্র উপায়।

আমার মত ভোজন রসিকের কাছে এই ব্যবস্থাকে "দুর্গাপুজোয় এক আক্ষেপ" ছাড়া আর কিই বা বলতে পারি।

Malay Dutta Chowdhury started as a lecturer in Silchar, Assam and came to Pune in 1970. He completed his Ph.D. from NCL in 1975 and then went for post-doctoral research to USA. After teaching at Anna University, (Chennai) for a couple of years he returned to Pune to join the Mahindra group. At the age of 65, he retired as the Managing Director of Mahindra Composites Ltd. Now at 77, he leads a happy retired life, occasionally offering consultancy to Composites Technology and Business.

* প্রথম সংস্করণ থেকে পুনঃ প্রকাশিত

কোথাও সে রয়েছে নিশ্চিত

রমাব্রত ভট্টাচার্য

কোথাও সে রয়েছে নিশ্চিত
নদী তীরে পাহাড়ি রাস্তায়
অথবা নির্জনে
যার অন্বেষণে
আজো এলোমেলো পথে পথে
ঘুরে মরা যায়।
যদিও জানিনা তার নাম কোথায় নিবাস
তবু আজো আমার বিশ্বাস
নিশ্চিত সে রয়েছে এখানে
ট্রামে বাসে ভীড়ের রাস্তায়
অথবা সন্ধ্যার ঝলমল কাফে রেস্তোঁরায়
কোথায় কোথায়
ঠিক যেন ধরতে পারিনে, তবু জানি
বনলতা সেনের মত সে মেয়ে
দেখা হলে বলবে আমাকে একদিন
পাখির নীরের মত চোখ দুটি চেয়ে :
কোথায় ছিলেন এত দিন ।।

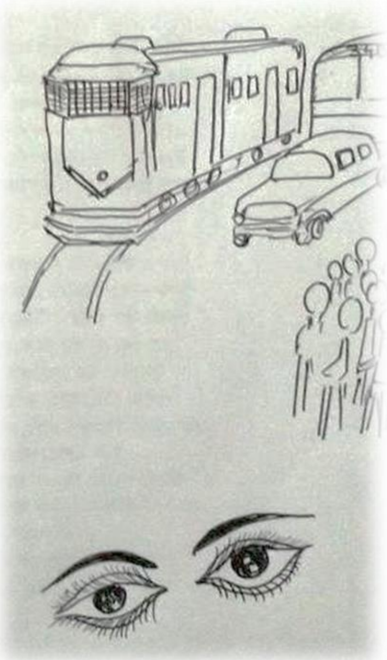

রমাব্রত ভট্টাচার্য কর্ম জীবনে DRDO তে অনেক প্রজেক্ট এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে পিনাকা রকেট সিস্টেমের সফল নির্মাণ এক উল্লেখযোগ্য অবদান। বর্তমানে পাষাণ অঞ্চলে সুতারবাড়ী রোডের বাসিন্দা। ছোট থেকেই কবিতা লিখতে ও আবৃত্তি করতে ভালো বাসেন।

Jyotishko Roy
Standard III, Delhi Public School

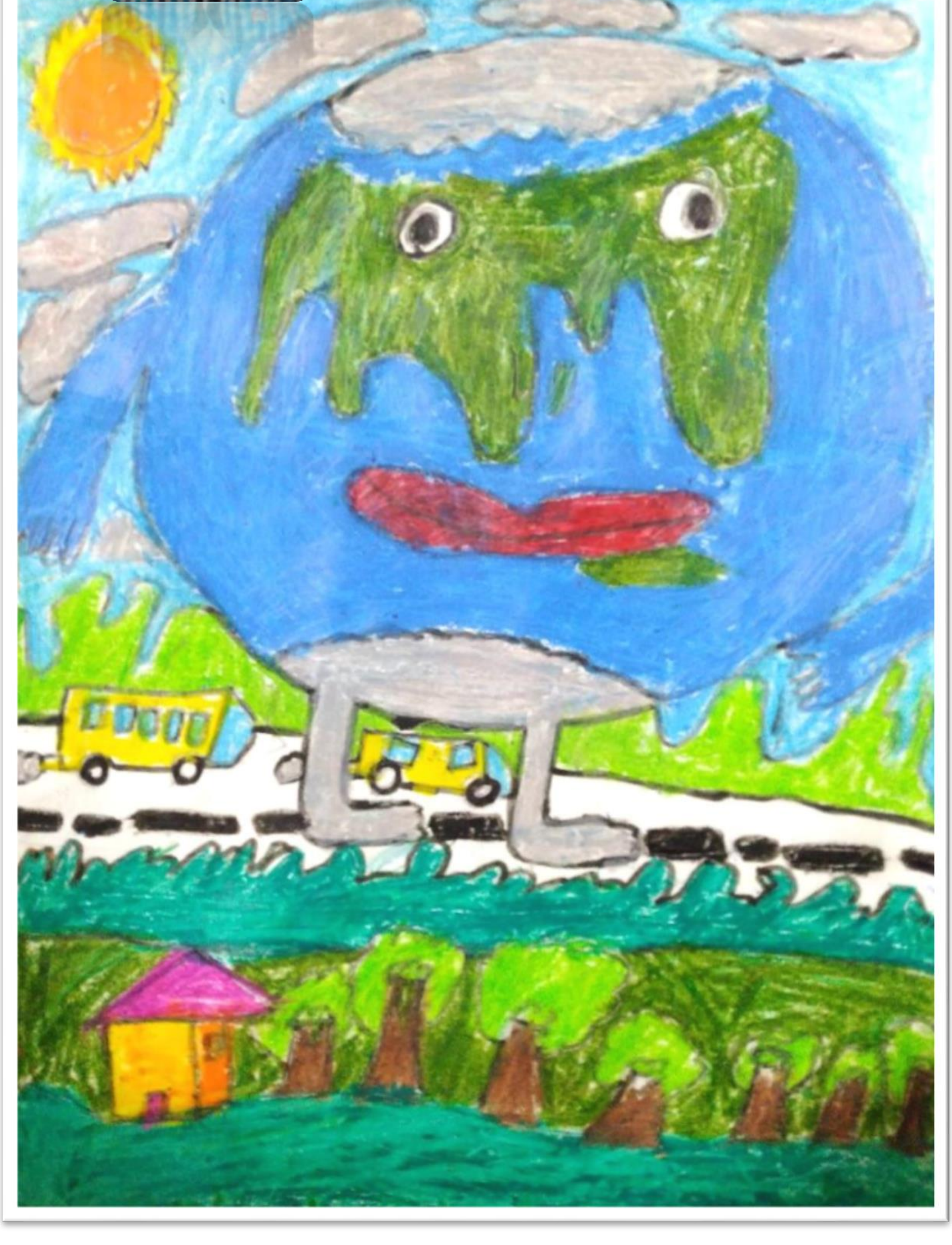

পঞ্চাশ পেরিয়ে

আরতি ভট্টাচার্য

বিবাহ -
বিশেষ ভাবে বহন করা,
স্বামী- স্ত্রী কে অপরকে
আজীবন পরম যত্নে প্রেমে
সহন করা |

এক নতুন সংসারের সূচনা করা,
অনেক স্বপ্ন দিয়ে গড়া -
সংসার তরণী বেয়ে নিয়ে যেতে
একজনের বৈঠা বাওয়া,
আর একজনের হাল ধরা,

চলতে চলতে জীবন কখনো
নানা রঙে রঙিন উজ্জ্বল, উজ্জ্বল বসন্ত বেলা
কখনো সূর্যের আগুন ঝরানো তাপে
দগ্ধ দীর্ঘ দহন বেলা |

কখনো ঝঞ্ঝা, ঝড়, তুফান, বান
কখনো প্রবল ভূমিকম্পে খান খান |
সংসারের জটিল আবর্তে পরে
ভাসতে ভাসতে ডোবা,
আবার ডুবতে ডুবতে ভাসা |

এভাবেই জীবনে চলে
সুখ- দুঃখের যাওয়া আসা |
এভাবেই অনেক সুখের বানে ভেসে,
অনেক দুঃখের সাগর সেঁচে,

আজ আমরা দুজনে বিবাহিত জীবনের
পঞ্চাশে পা দিলাম |
যাদের সুখে আমাদের ভোর সোনালী হয়
দুঃখে জগৎ অন্ধকার
তাদের সঙ্গে এ আনন্দ সন্ধ্যা
ভাগ করে নিলাম |

আজ বারবার মনে পড়ছে
পঞ্চাশ বছর আগের সেই
বৃষ্টি ভেজা আষাঢ় সন্ধ্যা,
সেই গোড়ের মালা রজনীগন্ধা |

আর মনে পড়ছে যাদের যত্নে ভালোবাসায়
সেই দিনটি বিশেষ হয়েছিল আমার জীবনে,
তাদের কথা |
আমাকে সুখী দেখবার জন্যে
তাদের আপ্রাণ আকুলতা |

আজ যারা আমাকে ঘিরে আছ
তারা সবাই আমার স্নেহের জন,
তাদের কাছে আমার শুধু এই আবেদন,
সে সম্পর্কে থেকে আছ যে যেমন
প্রতি জন্মে জন্মান্তরে
ভালোবেসে অন্তরে
হয়ে আমার আপন হতে আপন
পরম প্রিয়জন
বন্ধু স্বজন |

৭৬ বছর বয়সী **শ্রীমতি আরতি ভট্টাচার্য** পিপিবিপির সদস্য দেবপ্রতিম সিকিদার এর বড়মাসী। কবিতা লেখা ছাড়াও আরতিদেবী একজন গীতিকার ও সুরকার।

বুড়ো বুড়ীর কাজিয়া

রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বুড়ো - কি হল-তাড়াতাড়ি তৈরি হও। সন্ধ্যে হয়ে এলো, এর পরে অসুবিধায় পড়বে।

বুড়ী - তোমার তাতে কি? সন্ধ্যা হয় হোক ।

বুড়ো - আহা কষ্ট হবে। অন্ধকার হলে দেখতে পাবে না। তা ছাড়া তুমি কোথায় যাবে সেটাতো কিছু বলছ না, কেন যাচ্ছ সেটাও বললে না।

বুড়ী - আমি যেখানেই যাইনা কেন- তোমার তাতে কি?

বুড়ো - আমার তাতে কিছু নয় -তবে এতদিন সাহায্য করে এলাম সুতরাং শেষবার কেন সাহায্য করবো না।

বুড়ী- তা তো করবেই- আমি চলে গেলে তোমার সুবিধা হবে। শান্তিতে থাকবে।

বুড়ো - নিশ্চয়ই ঠিক বলেছ। আমার সুখের জন্য তুমি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছ- আর আমি সাহায্য করবো না, সেটা কি হয়? এতদিন পরে একটা মহৎ কাজ করতে চলছে - তাতে সাহায্য করে কিছু পুণ্যি তো সঞ্চয় করতেই হবে। থাক, তা তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার কোন প্রাক্তন প্রেমিকের বাড়ী? না তোমার কোন বান্ধবীর বাড়ী? বান্ধবী যদি বেঁচে না থাকে তাহলে চল কোন হোটেলে উঠিয়ে দিয়ে আসি। পরে ঘর ভাড়া কোরে সেখানে চলে যেও।

বুড়ী - আমি ছেলেদের কাছে যাচ্ছি।।

বুড়ো - মোটেই নয় ! ছেলেদের কাছে তুমি যেতে পারবেনা। তাদের সংসারে তুমি বোঝা অবশ্যই হবেনা। আমি কিছুতেই হতে দেবো না। তারা তাদের মত চলুক- তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে চলতে দাও। সেখানে তুমি বাধা হয়ে দাঁড়িওনা। তারা অবশ্যই বলবে - কিন্তু কিছুদিনের জন্য - পরে তারা বিরক্ত হবে। মুখে কিছু না বললেও কাজে বুঝিয়ে দেবে, তারপরেও যদি তুমি নির্লজ্জের মত ওখানে পড়ে থাক - তখন বাধ্য হবে তোমাকে তাড়িয়ে দিতে। অন্তত আমার জীবিত কালে এই ধরনের ঘটনার সম্মুখিন হতে দিও না।

বুড়ী - ঠিক আছে আমি তাহলে আত্মহত্যা করবো ।

বুড়ো - Excellent ! কি সুন্দর Decision!! এই মহৎ কাজটি তুমি আজ থেকে চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর আগে কেন নিলে না বলতো ?

বুড়ী- ও, তোমার তাহলে খুব সুবিধা হত না?

বুড়ো - সুবিধা হত কিনা জানিনা তবে আমার জীবনটা এমন ভাজা ভাজা হতনা!!

বুড়ী - ও-আমি তোমার জীবনকে ভাজাভাজা করেছি?

বুড়ো - এতে কি কোন সন্দেহ আছে?

বুড়ী - হ্যাঁ আছে। আমি রক্তপাত করে এতবছর তোমার সেবা করে এসে আজ ঐ বদনাম আমাকে কুড়োতে হল।

বুড়ো - আহা! বদনাম কেন বলছ - যেটা সত্য সেটাই বলেছি । আচ্ছা তুমি একটা কথা বল -রান্না করে খাওয়ালেই কি সেবা হয়ে গেল, একেই তুমি ভালবাসা বলবে। রান্না অবশ্যই তুমি করেছ - তবে কেউ খেতে পারলো কি পারলোনা না সেটা অবশ্যই তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।

বুড়ী- চুপ কর ! আমি তোমায় ভালবাসিনি, শুধু রান্না করে খাইয়েছি ?

বুড়ো - জানি না - কারণ ভালবাসা কি জিনিষ সেটা হয়তো আমি বুঝিনা। আমি কোনদিন ভালবাসা পাইনি, অবশ্য আমার ধারনা অনুযায়ী। আচ্ছা ঠিক আছে - তুমি তো ভালবেসেছ। তুমি আমাকে একটা কথা বল ? তুমি যাকে বিয়ে করেছ - সেই মানুষটি কে তুমি কি কোনদিন জানতে চেষ্টা করেছ ? সে কি চায় কি ভালোবাসে - কি পছন্দ কি অপছন্দ - কিভাবে সে জীবন যাপন করতে

চায়। তার স্ত্রী সম্বন্ধে কি মনোভাব - না তুমি জানার প্রয়োজন বোধ করনি। তুমি তোমার মতই চলেছ। তুমি স্বাধীনতা চেয়েছ - পুরো স্বাধীনতা পেয়েছ। যদিও তোমার স্বামী লক্ষ্য করেছে স্বাধীনতার অপব্যহার হচ্ছে - তবু কিছু বলেনি। আচ্ছা তুমি বলতো আমাদের মধ্যে এমন কোন ঘটনা বা মাহাত্য আছে যা তোমার অবর্তমানে আমাকে আন্দোলিত করবে - আমার অবর্তমানে তোমাকে ।

বুড়ী - থাম, থাম! আজ এত বছরের বিবাহিত জীবনে আমি তোমাকে কিছুই দিইনি কি ?

বুড়ো - অবশ্যই তুমি আমাকে দিয়েছ এবং আমি সেই জন্য চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে সন্তান উপহার দিয়েছ।

বুড়ী - ও, আর কিছু করিনি। নেমকখারাম - বেশ করেছি তোমার জীবনকে ভাজাভাজা করেছি। ভেজে না রাখলে পঁচে যেতে।

বুড়ো - ও ঠিক আমি তো মাছ - ফ্রিজ নেই সুতরাং ভেজে না রাখলে পোঁচে যেতাম। আসলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম - তোমার ভালবাসা আর মুসলমানের মুরগী পোষা এক !

বুড়ী - এর মধ্যে আবার মুসলমান এলো কোথা থেকে ?

বুড়ো - আরে ওটা কোন ব্যাপার নয় -কথায় কথায় মুসলমান শব্দটা এসেছে । ভয় নেই আমি কোন রাজনৈতিক নেতা নই- যে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে দেবো ।মুসলমান না ভেবে টুসলমান ভাব।

বুড়ী- টুসলমানটা আবার কি?

বুড়ো - আঃ - এতো মহা মুশকিলে পড়া গেল! ও সব ভূলে এখন আসল কথায় এসো । তুমি যা মহৎ কাজ করতে চলেছ - সেটা কি ভাবে?

বুড়ী - আমি ট্রেনে গলা দিয়ে মরবো !

বুড়ো - ভেরি গুড, ভেরি গুড দেখকি সুন্দর তোমার চিন্তাধারা। কিন্তু ?

বুড়ী- এর মধ্যে কিন্তু এল কেন?

বুড়ো - আমি এই সব ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবো না। লোক লজ্জা বলে তো একটা জিনিস আছে। এখান থেকে রেল লাইনটা বেশ দূরে। অটো ওয়ালা যদি তোমাকে নেয় তবে কোন অসুবিধা হবেনা।

বুড়ী - অটোওয়ালা নেবেনা কেন?

বুড়ো - ওদের কোন মতির ঠিক আছে নাকি? যাই হোক! ভেবে নাও - তুমি অটো করে রেললাইনে পৌছ গেলে। তারপর তুমি কোন প্রকারে রেলের পাট্টার উপর দিয়ে থপ, থপ করে চলেছ - পায়ের চাপে দুই একটা লাইনের পাটা হয়ত ভেঙেও গেল। তোমার কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ ট্রেনের হুইশেল - শুনতে পেলে - তুমি চিন্তায় পড়ে গেলে। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল। কারণ মরার আগের মুহূর্তে মানুষের বাঁচার ইচ্ছা হয় । শেষ চেষ্টা করে বাঁচার জন্য। তুমি দুই কানে হাত দিয়ে চেপে চলতে থাকলে। পিছন দিক থেকে আমি মৃদুস্বরে চিৎকার করতে করতে আসছি আর বলছি - ফিরে এসো... - এ রকম করে না। (ভেতরে ভেতরে কি বলছি সেটা না বলাই ভাল)।হঠাৎ তুমি দেখলে সামনের দিকে থেকে ট্রেন আসছে। তুমি ভয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলে। কাঁদতে লাগলে - চেষ্টা করতে লাগলে ট্রেন লাইন থেকে সরে আসার। কিন্তু পারছ না। হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে গেলে - দেহটা ট্রেনলাইনের বাহিরে চলে এলো কিন্তু একটি পা ট্রেন লাইনের উপর ট্রেনটা চলে গেল - শুধু একটু শব্দ হল - ক্যাঁচ করে বিকট আওয়াজ । মাগো ..... ব্যাস একটি পা চলে গেল - আর হল না। খোঁড়া হলে। এখন ভেবে দেখ ট্রেনে গলা দেবে না অন্য কিছু করবে ?

বুড়ী- আমি মরবোই -জলে ডুবে মরবো ।

বুড়ো - হ্যা! এটা অবশ্য সম্ভব। কারণ কোন প্রকারে জলে পড়লেই তলিয়ে যাবে। কিন্তু...

বুড়ী - আবার এরমধ্যেও কিন্তু কেন?

বুড়ো - হ্যা মানে সেই একই ব্যাপার । বাঁচার শেষ ইচ্ছা ! তুমি চলেছো দীঘির কিনারা দিয়ে। হঠাৎ পা পিছলে জলের মধ্যে তলিয়ে গেলে - তোমার কাজ সম্পন্ন হল। দূর থেকে লোকজন ছুটে

এসে টেনে হিঁচড়ে জল থেকে পাড়ে ওঠালো তোমাকে । তোমার নিশ্বাস পড়ছে না । হঠাৎ একজন তোমার পেটে লাথি মারলো । তাই দেখে অন্যান্যরা কিল চড় ঘুসি মারতে আরম্ভ করলো । হঠাৎ তোমার মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগলো - তুমি বেঁচে উঠলে । এখন চিন্তা করে দেখ তুমি অত কিল চড় ঘুসি লাথি সহ্য করতে পারবে কিনা। মোর তো হলোই না উপরন্তু মার খেলে।

বুড়ী - (কিছু ক্ষণ ভেবে) আমি তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো !

বুড়ো - হ্যাঁ ! সেটা অবশ্য হতে পারে- কিন্তু....

বুড়ী - আবার কিন্তু।

বুড়ো - না বলছিলাম উত্তম প্রস্তাব। অবশ্য কোন রকম অঘটন যদি না ঘটে তুমি অবশ্যই আমার অবর্তমানে সিলিং ফ্যানে কাপড় জড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে টুলটাকে ঠেলে ফেলে দেবে। যে মুহূর্তে তুমি টুলটাকে ঠেলে ফেললে - অমনি ফ্যান নিয়ে তুমি মেজেতে পড়ে গেলে - টুলে তোমার মাথা ফাটল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যান লাফ দিয়ে তোমার পায়ের উপর গিয়ে পড়লো, পা কাটলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

বুড়ী - থাম। সবকাজে বাঁধা দিতে জানে।

বুড়ো - আমি কোথায় বাঁধা দিলাম। আমি কি ঘটতে পারে সেইকথা বললাম।

বুড়ী - থাম, মনে কর আমি কিছু বুঝিনা। আমি এমন মোটা নই যে ফ্যান নিয়ে নিজে পড়বো

বুড়ো - যাক এই সব আজেবাজে কথা নিয়ে চিন্তানা করে যে মহৎ কাজের জন্য তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছ - সেটা নিয়েই চিন্তা কর। অতীতকে ছেড়ে দাও। অতীতকে কখনও বদলানাো যায় না, অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। এসব কথা ছেড়ে দিয়ে তুমি এখন কি চিন্তা করছ -কি ভাবে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করবে?

বুড়ী - আমি মরবোই ! - বিষ খেয়ে মরবো ।

বুড়ো - Impossible ! কোন প্রকারে সম্ভব নয়।

বুড়ী- কেন সম্ভব নয় কেন ?

বুড়ো - এই বাংলায় এখন সবেতেই ভেজাল। কথাবার্তায় ভেজাল, আলাপ আলোচনায় ভেজাল, ভালবাসায় ভেজাল - সম্পর্কে ভেজাল, হাসি কান্নায় ভেজাল, ঔষধ ভেজাল -বিষেও ভেজাল। সুতরাংঐ বিষ খেয়ে মরবে কিনা সন্দেহ আছে। ধরা যাক বিষ খেয়ে তোমার অবস্থা সঙ্গীন। মুখ দিয়ে ফ্যানা বেরুচ্ছে। আমি দেখতে পেয়ে লোকজন ডেকে অ্যাম্বুলেন্স করে তোমাকে হাসপালে নিয়ে যাওয়া হল।ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে পাম্প করে পেট থেকে বিষ বের করে দিল। তোমার এবারেও মরা হলোনা। দুঃখ করোনা !

বুড়ী - প্রথমেই কেন তুমি আমাকে বের করে দাওনি, মেরে ফেলনি।

বুড়ো - কিসব আজেবাজে কথা বলছ।

বুড়ী- আজেবাজে নয়।

বুড়ো - ঠিক আছে তবে শোনো । তোমাকে বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার রক্ষনা বেক্ষনের দায়িত্ব আমার উপর এসে যায়। তাড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কোন প্রকারেই এই বংশে কালির দাগ লাগাতে চাইনি। তোমার জীবন নষ্ট করতে চাইনি। সারা জীবনে তো আমার কথা শোনোনি - এখন যদিআমার কথা শোনো তবে অবশ্যই তোমার মৃত্যু হবে।

বুড়ী - কি কথা বোলো - বিচার করে দেখবো ।

বুড়ো - তুমি এক কাজ কর। তোমার তো অনেক চাহনেওলা আছে, এখন দেখ তার মধ্যে কারা কারা বেঁচে আছে। তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেও। তাকে বল জীবনে অনেক মজা লুঠেছ - আজ আমার একটু উপকার কর। আমার অবর্তমানে ওকে ঘরে ডেকে বল তোমার গলা টিপে অথবা মুখে বালিশ চেপে মেরে ফেলতে। ব্যাস তুমি নিশ্চয় মরবে। ওকে পালাতে হয়তঃ কেউ দেখে ফেলতে

পারে। লোকজন, পুলিশে ঘর ভরে যাবে- পরেরদিন কাগজে বেরুবে পুরোনো প্রেমিকরে হাতে নায়িকার মৃত্যু, ড্যাং না ড্যাং !

বুড়ী - চুপ কর ছোটোলোক কোথাকার । মুখে যা আসছে বলে যাচ্ছে। মুখে কোন লাগাম নেই। মরবো, আমি বাড়ী ছেড়ে নড়ব না।এখানেই থাকবো । এইটাই আমার বাড়ী।

বুড়ো - আরে আরে কি বলছ ? এতদিন তো এটাকে পান্থশালা হিসাবে ব্যবহার করে এসেছ। এখন হঠাৎ তোমার বাড়ী হয়ে গেল ? তার মানে আমাকেই যেতে হবে।

বুড়ী - না তুমি ও যাবেনা। এটা তোমার ও বাড়ী। আমি চা করতে যাচ্ছি।

বুড়ো - আরে শোনো শোনো ...তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

বুড়ী - ঠিক আছে।

বুড়ো - হ্যায় ভগবান - ইহাও দেখিতে হইল। সারা জীবন চা চাইলে অমনি চিৎকার করে কলেরগান বেজে উঠতো । দিনরাত চা- চা- চা জীবনটা আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বেহাল করে দিল। চায়ের সঙ্গে একবাটি খিচুনি জুটতো । আর আজ নিজে থেকে চা বানাতে গেল এটা কি - এটাকি পরিবর্তন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। এতদিন জেনে এসেছি যা নাহয় নয় বছরে তা হয় না ৯০ বছরে। ওরতো এখনও ৯০ বছর হয়নি। তবে কি এটা পশ্চিম বঙ্গের মতো জোর করে পরিবর্তন আনা? হায় ভেবেছিলাম আরো 5/10 বছর বাঁচবো- তা আর হলোনা । শোনো চা বানিয়ে তৈরী হয়ে নিও । একটু বেরুতে হবে । ডাক্তার দেখাতে হবে তো । হায় ভগবান - রক্ষা করো প্রভু ।

Ramdas Bandyopadhyay, Tanmoy Bandyopadhyay's father, has been instrumental in promoting theatre and Bengali culture in Nagpur. Be it Nazul-Rabindra Geet Sandhya or Baul Geete, or a famous drama from Kolkata RamDa has infused the wonders of Bengal into the orange city's probashi Bangalis. A prolific actor-director, RamDa has produced numerous award-winning plays for his cultural club – ROOP RANGA. His passion for all things Bengali permeats thru his writing, be it prose or poetry.

বোঁচার মার পাঁচালি

ইচ্ছাময়ী রায়চৌধুরী

বহুকালের পুরোনো ঝি, সবাই ডাকে বোঁচার মা
মিষ্টি মধুর স্বভাবটি তার, পাইনা খুঁজে উপমা |
অনর্গল সে কথা বলে হাসি মাখা মুখখানা,
আলস্য সে জানে নাকো, খেতেই চলে একটানা |
বারব্রত সব করে সে বয়স তার পঞ্চান্ন,
কাঁকর মেশা চাল দিয়ে সে, আজও করে নবান্ন |
সবার ডাকে হাজির থাকে কাজে নয় সে গররাজি
ইদানিং সে শিখে গেছে দু চার কথা ইংরাজি |
পাড়ার খবর সব রাখে সে, কোথায় কি হয় ঘটনা,
বাড়ি এসে সবিস্তারে করে তারই বর্ণনা |

বাধলো যুদ্ধ ইউরোপে, বিমান, বোমা, প্যারাসুট,
মরছে মানুষ লাখে লাখে ইঙ্গমার্কিন বাধলো জোট |
কোথায় নাকি রুশ দেশেতে করছে লড়াই জার্মানি,
হেথায় নাকি এরোপ্লেনে আসলো বলে জাপানি
শুনছো নাকি দিদিমনি ও পিসিমা-মা কোথায়?
জাপানিরা ফেলছে বোমা চাটগাঁয়ে আর কলকাতায় |
ওদিক থেকে বর্মা দিয়ে আসছে নাকি সুভাষ বোস,
মনিপুর এ বোমা ফেলে আসামে নেমেছে ফৌজ |
আসছে বেগে বেগে দখল করে সগৌরবে কোহিমা,
আসতে যেতে এসব খবর নিত্য শোনে বোঁচার মা |

মরবো এবার দিদিমনি খাদ্য নাকি মিলবে না,
সকল জিনিস আক্রা হলো মানুষ এবার বাঁচবে না |
রেশন দোকান খুলেছে ওই চাঁপার দেবর গোরাচাঁদ
লাইন দিয়েছে মেয়ে পুরুষ বৌ ঝিয়েরাও যায়নি বাদ |
' কন্টুলে' দেয় চাল গো দিদি, আধেক কাঁকর আধেক চাল,
তাই নিয়ে কি কাড়াকাড়ি রৌদ্রে জলে নাজেহাল |
' বেলেক' করে আমার মেয়ে চন্দ্রাবতীর ভাসুরে
অনেক টাকার দালান-কোঠা করেছে মেয়ের শ্বশুরে |
কেলো সোনা চাকরি করে মিলিটারির ঘাঁটিতে,
রকমারি সব জিনিস আনছে কেলো বাড়িতে|
' টেরাক' চড়ে ঘাঁটির কাজে চলছে কত মেয়ে বুড়ি,
কুসুমলতা ও চাকরি করে মাইনে পায় সে তিনকুড়ি |

এসব খবর সঞ্চয়নে ব্যস্ত সদাই বোঁচার মা,
এমন সময় লাগলো দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা |
ঢোলের গায়ে পড়লো কাঠি বোঁচার মা হয় মনসা
এমন করে মারবে মানুষ পেয়েছে কি তামাশা ?
রক্ষা করার দায়িত্ব যার তারাই যদি হয় ভক্ষক
কার পানে আজ তাকাই বোলো, দেশ যে হলো অরাজক |
হাজার হাজার মরছে মানুষ অনাহার আকালে,
আগুন দিয়ে সংখ্যাতীত খাদ্যবস্তু জ্বালালে |
বোলো কি গো দিদিমনি, বুক যে পুড়ে হলো ছাই,
হারুর মেয়ে অতসী আর তুলসী রানীর খবর নাই|
ভোরের বেলা দোর খুলেছি পুলিশ বলে হুঁশিয়ার

"সাত বাজে তক ঘর মে রহ-বাহার মত্ যায় খবরদার"|
আমার মিনসে, কোথা ছিলে সাক্ষী গোপাল শিখন্ডি
রাত্রে যারা করলো তোমার কার্ফু আইনের সঁপিন্ডি |
দেখতে তখন পাইনি কেহ তোদের মাথার টিঁকি
এখন বুঝি বেরিয়েছ সব বুদ্ধিমানের ঢেঁকি"|
সুধায় আমায়, কোথায় যাবে?
কইনু "মনিব বাড়ি কাজ রয়েছে"
সময় হলেই পথ দিলে সে ছাড়ি |

ছুট দিয়েছি সমুখপানে মরি বাঁচি খেয়াল নাই
ত্রাসে মোর বুক শুকালো দেহে বুঝি প্রাণ নাই |
পথের ধরে পরে আছে রক্তমাখা একটি লাশ
কোন অভাগীর বাছারে হয় কে করলে এ সর্বনাশ |
পুলিশ এলো গাড়ি বোঝাই কাটা মানুষ রক্তে লাল,
এ লাশটাকেও তুলে নিয়ে চললো ছুটে হাসপাতাল |

বিভৎস্য এ কান্ড দেখে কেমন যেন হয়ে যাই
একটু খানিক এগিয়ে, এক পুলিশ ফাঁড়ি দেখতে পাই
কইনু তাদের, হ্যাগো বাবু দাওনা খানিক এগিয়ে,
রুখে উঠে পুলিশগুলো দিলে আমায় তাড়িয়ে |
বললে আমায় দুর হ মাগি, রাখিস নাকি প্রাণের ভয়?
এমনিই দিনে বাইরে আসিস সাহস তো তোর মন্দ নয় |
হতাশ হয়ে চারদিকে চাই, মন হয়ে যায় আনমনা
এমন সময় আসলো সেথায় ভলান্টিয়ার কয়জনা |
বললে তারা এ দুর্যোগে বের হয়েছে কেন মা ?
ভয় পেয়োনা, পৌঁছে দেব বলো তোমার ঠিকানা |
প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেলো ওদের মুখের সান্তনায়,
বেঁচে থাকুক বাছারা সব তারাকনাথের করুনায় |

সেকাল ছিল ভালো দিদি, সবাই রাখতো সবার মান,
দুঃখে সুখে সুহৃদ রূপে ছিল হিন্দু-মুসলমান|

পিপিবিপির সদস্য দেব শিকদার এর বাবার দিদিমা ছিলেন **ইচ্ছাময়ী রায়চৌধুরী** | জীবৎকালে ইনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন | বর্তমান কবিতাটি ১৯৪৫ সালে রচিত |

War: A gateway to hell

Tiyasha Ghosh

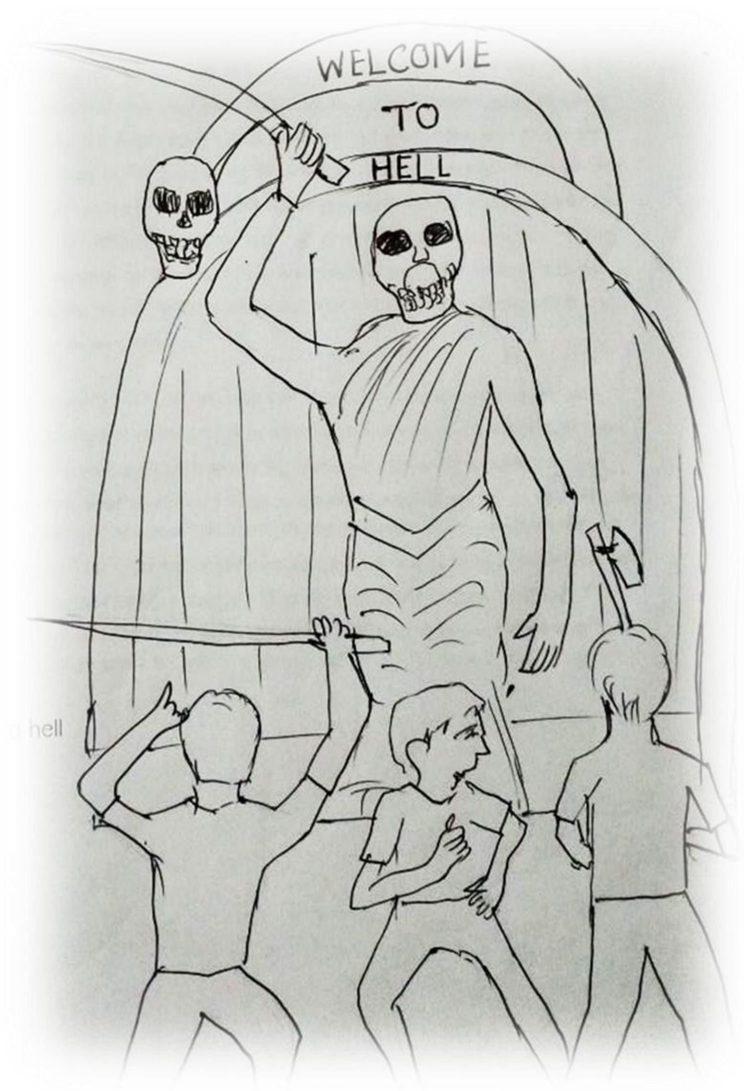

The war hasn't begun yet
But I'm already bleeding
The gates of hell are far away
But I'm already pleading

Will I see the end of this?
Will I make it through?
Will I come back marching?
Or covered in a shroud

There is no pride in sacrifice
No nation to serve
The weak at heart close their eyes
While the strong one's survive

Some are scared for life
Some are dead inside
While some emerge victorious
Chest out and head held high

No matter the consequences
We march onward and upward
We, the children of the future
To meet our fates at the gateway to hell.

Tiyasha Ghosh
Std. 12th Arts
St. Mira's College for Girls

Surangana Bhattacharya
Standard VIII, Sanskriti School

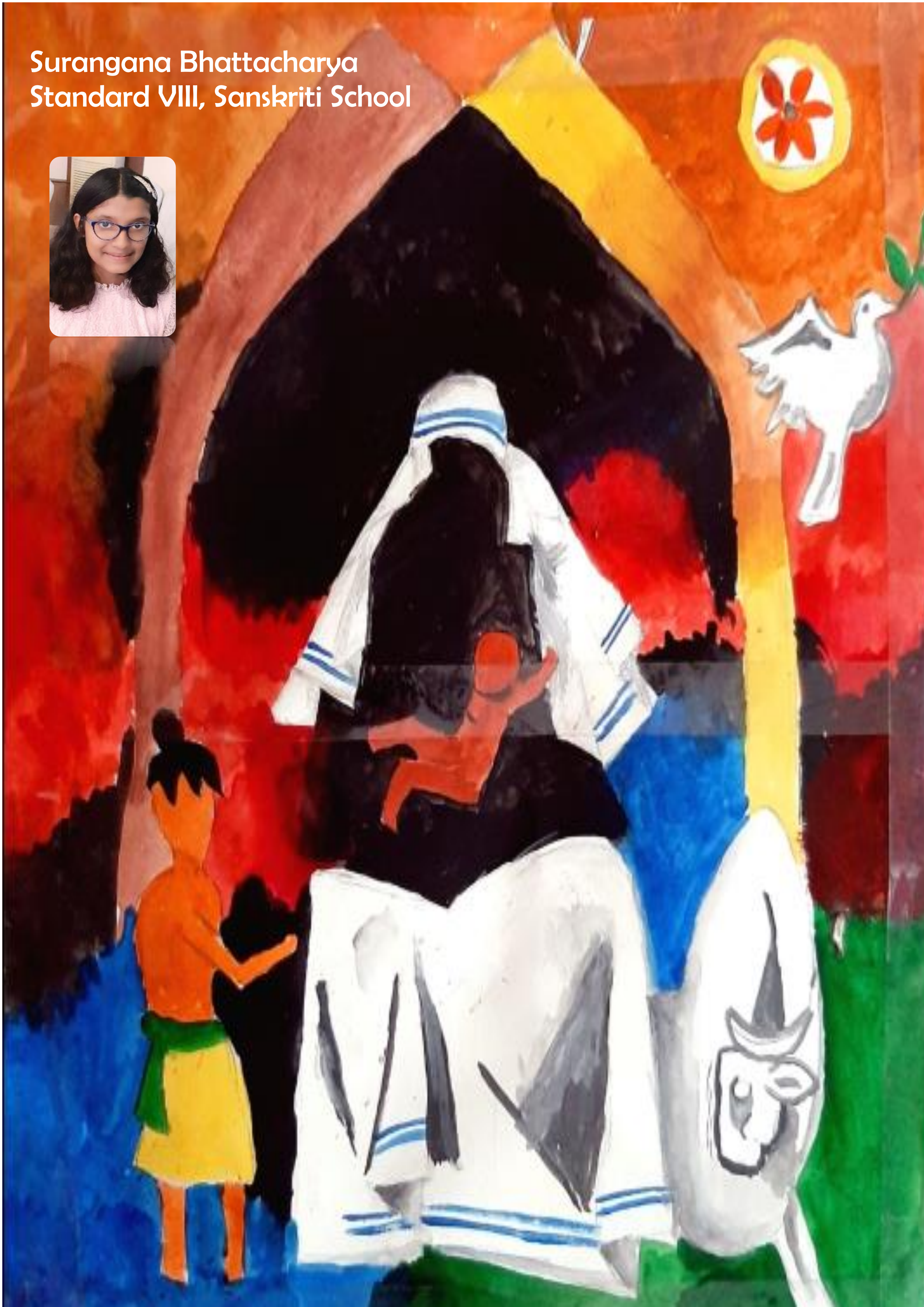

মৃত্যুরহস্য

ঊষসী রায় চৌধুরী

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবলাম, ফোনে কিছুক্ষণ ফেসবুক ঘেঁটে নি। কিন্তু ফোন খুলতেই দেখলাম, ডেটা প্যাক ফুরিয়ে গেছে।

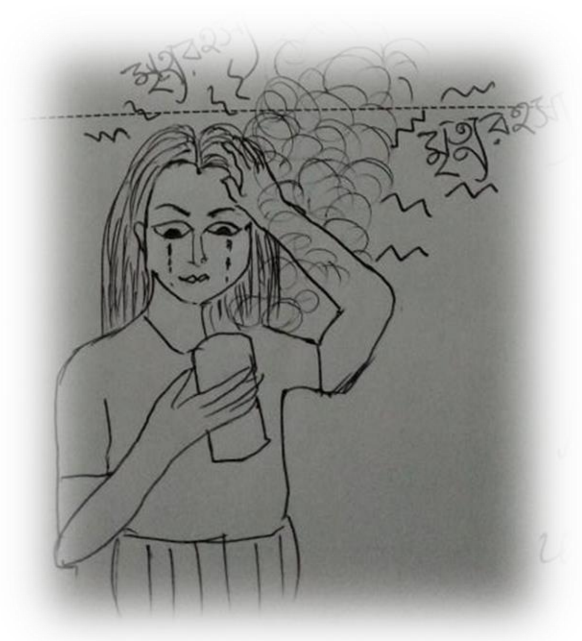

কি আর করব? আমি চেক করলাম, আশেপাশে কোনো ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক আছে কিনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাসওয়ার্ড চাইছিল, তবে একটা নেটওয়ার্কে চাইল না। সেটাতেই কানেক্ট করে নিলাম।

নেটওয়ার্কের নামটা বেশ আজব - মৃত্যুরহস্য। মনে মনে হাসলাম। যার নেটওয়ার্ক, সে হয়তো গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালবাসে। তবে নাম যাই হোক, নেটওয়ার্কটার স্পিড বেশ ভালো। অনেকক্ষণ ব্যাবহার করলাম।

বাস এসে পৌঁছতে উঠে পড়লাম। জানলার ধারে বসে দেখলাম, সেই আজব নামের ওয়াইফাই এখনো আমার ফোনে কাজ করছে।

যার ফোন, সেও হয়তো এই বাসে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই, স্টপে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, সেই নেটওয়ার্কটা এখনো আমার ফোনে আছে।

এইবার ভয় পেতে শুরু করলাম। কেউ আমার পেছু নেয়নি তো?

বাড়ি গিয়ে ফোন অফ করে আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম - তবে তা করার আগে দেখে নিলাম, সেই নেটওয়ার্ক আমাকে বাড়ি অব্দি ধাওয়া করে এসেছে।

রাত্রে কিছুই খেতে ইচ্ছে করল না। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবং যত ফোনের ঘটনাটার কথা ভাবতে লাগলাম, ভয় তত বেশি করতে লাগল।

চিন্তাভাবনা করতে করতে বিছানায় এপাশ- ওপাশ করছিলাম। এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। ফোন তো সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম, তাহলে কি করে..?

ভীষণ ভয় করছিল, তবু আমি গিয়ে ফোন ধরলাম। অচেনা নম্বর।

"এটা কি সানিয়া বসুর ফোন?" একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শুনতেই ভয় আরো বেড়ে গেল।

"হ্যাঁ। কে বলছেন?"

কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর অস্পষ্ট কি একটা কানে এল। ভলিউম বাড়িয়ে দিলাম।

"মৃত্যুরহস্য....মৃত্যুরহস্য...."

চিৎকার করে ফোন ফেলে দিলাম। মাটিতে পড়তেই ফোন থেকে কালো রঙের ধোঁয়া বেরোতে লাগল। গন্ধটা নাকে আসামাত্র গা গুলোতে লাগল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

ধোঁয়া এসে আমাকে একেবারে চেপে ধরল। কিছু দেখতে, শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু কে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে লাগল, "মৃত্যুরহস্য...মৃত্যুরহস্য..."

*****

কলেজ থেকে বেরিয়ে সায়ন ফোন বের করল। কিছুদিন ধরে নেটে যে সানিয়া বসুর রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্যই সে ওটা নিয়ে রিসার্চ করতে চাইছিল।

দেখল, ডেটা প্যাক ফুরিয়ে গেছে। পাশের একটি নেটওয়ার্কে ও কানেক্ট করে নিল।

দিদির গাড়ি এসে পড়াতে ও তাতে চেপে বসল। তখনও তার কানেকশন ছিল।

নেটওয়ার্কের নাম, মৃত্যুরহস্য।

উষসী রায় চৌধুরী
অষ্টম শ্রেণী
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, গণেশখিন্দ

One More Due

Shasmita Sanyal

“How many colours bears the tricolour?”
Asked the mean looking teacher in manner cold.
“I know! I know! I know!” shouted the tiny bubble
The youngest one in class, the only five year old

The grand hag’s gaze zeroed down on him
She pointed her long sharp cane at him and said,
“If you go wrong, four on each filthy fist.”
“Five colours”, quoth the lad, with as much weight as lead...

The cane tore through the air towards his trembling fist
The terror in his eyes at its highest crest
The swish of the cane was the only echo that sounded
“Name your five”, was the next

“Saffron, white green”, before the next whip he sobbed
“And the Ashok Chakra blue”
“That’s just four, sounded with another swish
There’s still one more due.”

“And the big red spot”, sobbed the tiny bubble
“Imbecile, your flag bears no such colour”
“But it was there in the centre, when my Daddy
Came back home wrapped in your tricolour”

Guilt shrouded the teacher’s face
Her trembling lips turned away from the class’ view
“Teacher, teacher”, said he then, with sight blurred and fist extended,
“I still have one more due.”

Shasmita Sanyal
Standard 10
St. Mart’s School

Adwitiya Dhar
Standard III
Indira national School

Adwitiyaa Dhar class - 3

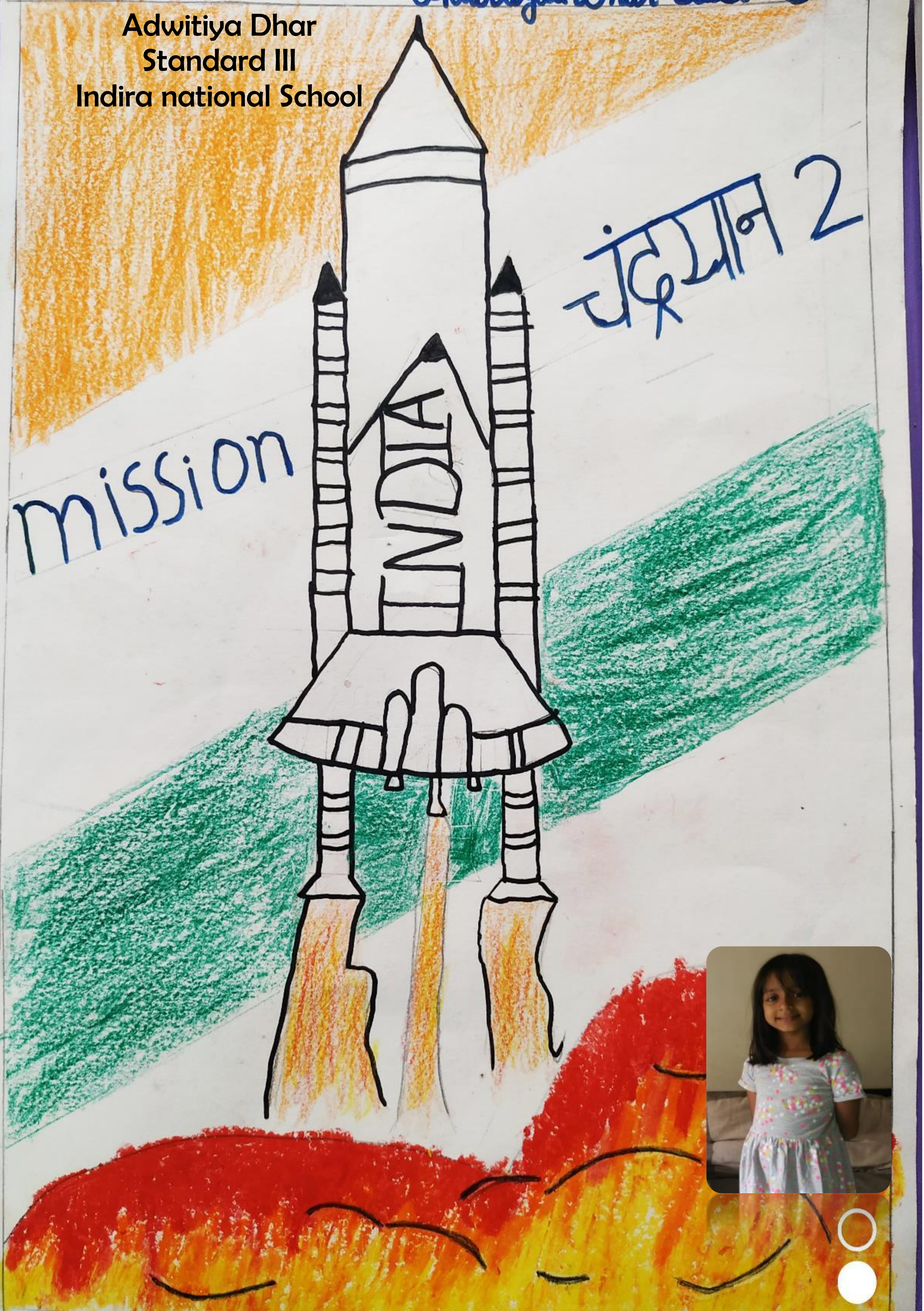
mission
INDIA
चंद्रयान 2

টান

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

কাউন্টার থেকে প্রশ্ন করায়, কিছু না ভাবা উত্তর এলো "লালমাটিয়া" । আসলে কাউন্টার এর পাশে দাঁড় করানো লম্বা একটা কাঠের উপড়ে অনেক স্টেশনের নাম । পড়তে পড়তে চোখ যখন "লালমাটিয়া"-তে পোঁছে ছিল, ঠিক তখনই প্রশ্নটা কানে এসেছিল - "কোন স্টেশন"?

পকেট কত টাকা ছিল, সেই টাকা দিয়ে আদৌ ঐ স্টেশনের টিকিট কাটা যাবে কিনা, এসব কথা একবারের জন্যেও মনে পড়েনি । টিকিটটা হাতে নিয়ে কাউন্টার ছাড়ার পরে, দেখা হলো কালো পোশাক পরা, এক রেল কর্মচারীর সাথে। ভাগ্য যে কার ভালো, তা জানি না । তবে, তারই সাহায্যে সুপ্রকাশ বাবু উঠে বসলেন গন্তব্যের রেলগাড়ির কামরায় ।

ট্রেন চলছে । মাঝেমাঝে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে । কিছু মানুষ যাচ্ছে । কিছু মানুষ নেমে যাচ্ছে । কেউবা বলছে, দাদা একটু সরে বসবেন, আরেকজনের জায়গা হয়ে যাবে । মাঝে টিকিট চেকার এল । মনে হলো সামান্য চাঞ্চল্য । একে একে সবার টিকিট দেখা । সুপ্রকাশ বাবুর ও । বাক্য বিনিময় হলো না ।

ট্রেনের জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে কোলের উপর । ট্রেনটা চলছে । কত জোরে, কে জানে!! জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধানক্ষেত, পুকুর, নারকেল গাছ, অনেকগুলো বাচ্চা ক্রিকেট খেলছে, কোথায় একটা লোক চলে গেল সাইকেল নিয়ে, একটা বউ মাথায় কাঠের ঝাঁকা, সবই খুব পরিচিত দৃশ্য । নতুনত্ব নেই । তবুও দেখতে বেশ ।

সুপ্রকাশ বাবু বাড়ি যাচ্ছেন । কিন্তু বাড়িটা কোথায় ? "লালমাটিয়া" শব্দটা আর মনে পড়ছে না। পকেট থেকে টিকিটটা বের করলেন।একবার ভুলেই গেছিলেন এটার কথা । টিকিটের সাথে বেরিয়ে এলো বেশ কিছু খুচরো টাকা । টাকা গুলো দেখে খুব হাসি পেল ।

নোংরা জামা পরা একটা ছেলে । বোধহয় তার বাবার সাথে । বাবা অন্ধ । ভিক্ষা করছে । দুজনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রকাশ বাবুর সামনে । সুপ্রকাশ বাবু, পকেট থেকে যা কিছু বার করেছিলেন সবটাই তুলে দিলেন ছেলেটা হাতে । টাকাগুলো রেখে, টিকিটটা ফেরত দিলো ছেলেটা । বেশ বুদ্ধিমান । বেশ মজার ব্যপার, একটু আগে যারা হাত পেতেছিলো টাকার জন্য, তাদের কাছে এখন তার সমস্ত টাকা আর সুপ্রকাশ বাবুর পকেট খালি ।

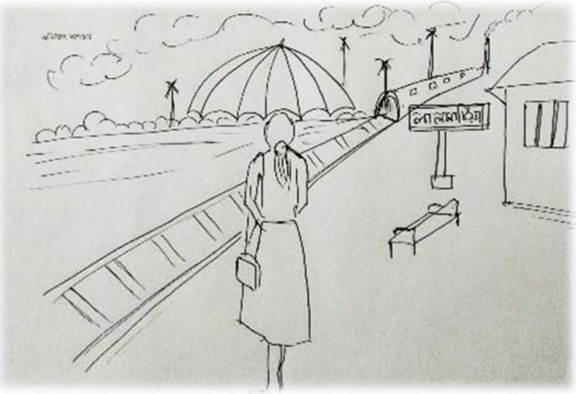

সুপ্রকাশ বাবু বাড়ি যাচ্ছেন, কোথায় বাড়ি ! টিকিট টার মধ্যে "লালমাটিয়া" লেখা । নামটা ভারী সুন্দর । লালমাটিয়া । আলোড়ন জাগানো নামটা । চেনা চেনা ।

ট্রেনটা চলছে । কত রকমের ফেরিওয়ালা । এখন যে এসেছে, সে একটা লম্বা বাঁশের গায়ে নানান কিছু নিয়েছে। মানিব্যাগ, চাবির রিং, সেফটি পিন, ছোট্ট পার্স, টিপের পাতা, একটা পাজল সেখানে 1 থেকে 15 সংখ্যা লেখা, আছে রুবিক কিউব, বাচ্চাদের খেলনা, রুমাল - কি নেই তার কাছে!! দুনিয়ার যত প্রয়োজনীয় জিনিস । কিন্তু এর কোনটাই সুপ্রকাশ বাবুর কোন প্রয়োজনে লাগবেনা । সুপ্রকাশ বাবুকে বাড়ি ফিরতে হবে, কিন্তু বাড়িতে কে কে আছে, কে জানে!

এখন আর ভাবতে ভালো লাগছে না । জানলা দিয়ে তাকাতেই, অনেক বেশি ভালো লাগছে । ধীরে ধীরে কম্পার্টমেন্ট খালি হয়ে আসছে । সীমিত যাত্রী । বেশিরভাগেরই চোখ বোজা । কি হয় চোখ খুলে রেখে! কি দেখি? দেখেই বা কি লাভ!! আচ্ছা চোখ বুজে থাকলে কি কিছুই দেখা যায় না! বেশ মজার ব্যাপার না! আমরা কি শুধু চোখ দিয়েই দেখি!!

ট্রেনটা কোথাও দাঁড়ালো । একটা রুক্ষ স্টেশন । লাল ইটের মোরাম বিছানো । লম্বা । কোথাও কেউ নেই দুই প্রান্তে । এক কথায় ধুধু প্রান্তর । যদিও বেশ মনের মতন স্টেশন । নামা যেতে পারে । কিন্তু বাড়ি কি এখানে ? এটা কোন স্টেশন, কি নাম ?

কি যায় আসে, নামে ? কি জানি দু' দিন পরে হয়তো এই স্টেশনটার নামও "লালমাটিয়া" হয়ে যাবে । কি মজা না, আমরা ইচ্ছে মতন নাম দিই স্টেশনের, তারপর সেই নামকে আঁকড়ে ধরে, গড়ে ওঠে জনবসতি !! তারপর, বাকীটা ইতিহাস ।

সুপ্রকাশ বাবু এখন একটা লম্বা প্লাটফর্মের একপ্রান্তে বসে আছেন । কিন্তু কার জন্য ! কোন স্টেশন এটা ? কোন ট্রেনের প্রতীক্ষা !

সারা পৃথিবী জুড়ে কতশত ট্রেন চলছে, আর কত স্টেশন ! আর সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কত সুপ্রকাশ বাবুরা, কেউবা ট্রেনে, কেউবা প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছেন । কেন ! কার জন্য ! কেউ জানে না, কখনো জানতে পারে না! যেমন কেউ জানে না, এক সপ্তাহ পর, কোনো এক পেপারে প্রকাশিত এক মেয়ের আর্তি, "বাবা যেখানেই থাকো ফিরে এসো", নিচে কোন এক সুপ্রকাশ বাবুর ছবি, আর তার নিচে দু লাইন লেখা - কোন সুহৃদ ব্যক্তি খবর পেলে যোগাযোগ করবেন এই ঠিকানায়... উপরোক্ত ছবিটি আমার বাবার, উনি অ্যলজাইমায় আক্রান্ত, শুধু নিজের নামটুকুই বলতে পারেন

অভিজিৎ দাশগুপ্ত কর্মসূত্রে পুনের বাসিন্দা । বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য সঙ্গে রয়েছে এক নাড়ীর টান । ভালোবাসে গল্প লিখতে আর গল্প করতে ।

সিন্ডেরেলা

বর্ণালী মুখোপাধ্যায়

সোহনলাল বাহাদুরের দুটি বউ, তিনটি সন্তান এবং একটি অতলান্ত নাভিগহ্বর। এছাড়াও পুরুষানুক্রমিক আধ হাত লম্বা কুকড়ি ও অসম্ভব ছুঁচলো একটি গোঁফ তার আমানত।

তবু এই কল্প গল্পে সে বাহ্য মাত্র।

এই গল্প রম্ভার। সে সোহনের প্রথম বউ। তার কোলে মেয়েটি এলো রক্তের বিমারি নিয়ে।তাজা মুরগি বা হাঁসের আন্ডা খাইয়েও তেমন লাভ হলো না। রোগটি থ্যালাসেমিয়া। ডাক্তারি জাঁচে মালুম পড়লো রম্ভা হলো গিয়ে বাহক। আর বাচ্চা পয়দা করা চলবে না। সোহন চটজলদি অম্বাকে বিয়ে করে নিয়ে এলো। সে রম্ভার মামার মেয়ে। ঠিকাদারের কাছে তার বাঁধা মজদুরি। শরীরে ভরপুর তাকৎ। দু দুটি ছেলে, তরতর করে বেড়ে উঠছে কদম গাছের মতো।

সমস্ত শরীরে কালশিটে নিয়ে রম্ভার ঘুম ভাঙে যখন, পাখিদের চোখে তখনও শেষ ঘুম। শুধু পিয়াল গাছের কোটরে জেগে থাকা প্যাঁচাটা দেখে, রম্ভা বিড়বিড় করতে করতে ওঠে, গুটিয়ে থাকা কাঁথাটা প্রবল মমতায় মেয়েটার শরীরে চাপা দেয়। তারপর দেয়, অম্বার ঘরের বন্ধ দরজায় একটি প্রবল ধাক্কা। অম্বা উঠে পড়ে। ক্লিন্ন বিছানায় হাত পা এলিয়ে শুধু সোহনলাল পড়ে থাকে। লালাতে জ্যাবজ্যাবে তার বালিশ।

বাঙলোর পিছন দিকে আউটহাউস গুলো। দুটো ঘর উঠোন নিয়ে ড্রাইভার সোহনলালের সংসার । অন্য ঘরটাতে বুড়ো মালী ফাগুয়া একা থাকে। এইবার কাকটি উঠে ডাক দিলে ফাগুয়াও উঠবে। তারপর ভয়ানক হুটোপাটি শুরু হবে ওদের মধ্যে এক বাথরুম আর একটাই পায়খানা নিয়ে । অবিলম্বে ঝগড়া টগড়া মিটেও যাবে এবং অম্বা তখন বাগানে জল দেবে।সে সময়, রম্ভা ঝাড়ু দিয়ে ঝকঝকে করে ফেলবে পোর্টিকো, ড্রাইভ ওয়ে, পিছনের উঠোন, ওদিকের লন। সকালের সিকিউরিটির অপেক্ষায় গভীর হাই তুলে গুটকা মুখে ঢালবে রাতের সিকিউরিটি। এই লোকটাকে রম্ভা চেনে না। তবে নজর দেখে বুঝেছে নিশ্চিত, কামিনা আদমি। ঝাড়ু হয়ে গেলে যন্ত্রের মতো দুই বোন ঘরে ফেরে।একজন চা বানালে অন্যজন বাচ্চাদের ঘুম ভাঙায়।

দুই বোন পালা করে সোহনের হাতে ঠ্যাঙানি ও গাল খেতে খেতে রুটিন কাজ সারে নির্বিকার। তবে, রম্ভার মেয়েটির থ্যালাসেমিয়া। তাই সে দুটি গাল বেশি খায়। যখন সোহন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ঘড়িতে সাড়ে ছয়, রম্ভা গোপনে সেই ফ্যাকাশে বালিকার খাঁদা নাকে একটি গভীর চুম্বন আঁকে। এটি এক অলোক মুহূর্ত, স্বর্গ থেকে হঠাৎ খসে পড়া অথচ প্রতিদিন তৈরি হয়। অম্বা আর তার ছেলে দুটি এক সঙ্গে বের হয়। সে ঠিকাদারের সোহাগী মজদুর, সাত হাজার তঙ্খা। মাকে সাইকেলে বসিয়ে ছেলেরা তুরতুরিয়ে সরকারী স্কুলে পড়তে যায়। রম্ভা তখন বাঙলোর ভিতর।ফলের রস বানাতে বানাতে সে এই ছবিটা দেখে আর মোক্ষম গালি গুলো সব ঈশ্বরকে নিবেদন করে। তারপর আবার কাজ কাজ এবং কাজ। একটা কথাও না বলে সে কাজ করে। মেমসাহেবটি বড় অগোছালো। ডাস্টিং করতে গিয়ে কোনদিন সে হীরের আংটি খুঁজে পায় কখনো বা কাপড় ধুতে গিয়ে সাহেবের পকেটে তাজা দু হাজারী নোট।কারোকে কিছুই বলে না সে । চুপচাপ চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের কোণে সে সব গুছিয়ে রাখে। আসলে রম্ভা চুরি করতে শেখে নি! ! মেমসাহেব হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া জিনিস পেয়ে বড্ড খুশি হয়। উদার হাতে কোনদিন ওকে পঞ্চাশটাকা বখশিশ দিয়ে দিলো, কখনো বা খুব বেশি পেকে যাওয়া মুসাম্বি, ফেলে দেওয়ার আগের, ডালিম। রম্ভা হাত পেতে নেয় ফলগুলো।তারপর নিঃশব্দে পিছনের নালীতে ফেলে দিয়ে আসে।

আজকেও সে একটা সোনার দুল পেয়েছে বাথরুমে। নির্দিষ্ট ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে রম্ভা দেখল এক আশ্চর্য কালো রাত পোষাক । গভীর কালো সেই গাউন, এতো স্বচ্ছ তার নেট, এতো নরম তার সিল্ক, শরীরের ভিতরে যে গভীর শরীর, তাকে তুলে আনে, যেন ভাসিয়ে রাখে। ওর শিড়দাঁড়ায় শিহরণ খেলে যায় কতো দিন পরে।

সোহনলাল সাহেবকে নিয়ে অফিস রওনা হলে মেমসাহেব গল্ফ খেলতে চলে গেল। এখন সকাল এগারোটার আগে আর কেউ আসবে না এখানে। রম্ভার মেয়ে একা ঘুমিয়ে থাকে নিঃসাড় । ফাগুয়া লনের ঘাস বাছে মাথা গুঁজে। রম্ভা এই সময়টুকু নিজের তাঁবে টেনে নিল। সে তখন সেই খেলাটা খেলে। তার খুব নিজের এক গোপন খেলা!

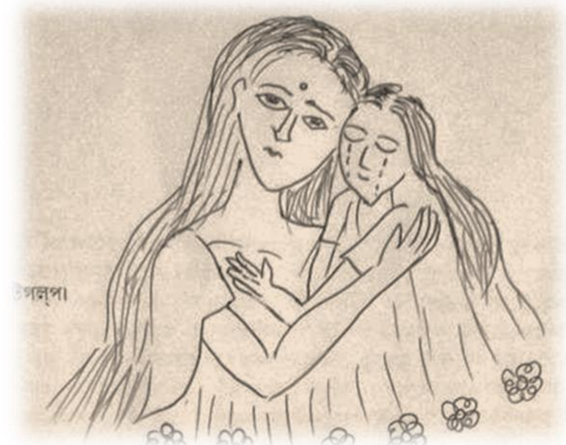

মেমসাহেবের বাথরুমে ঢুকে প্রথমে নগ্ন করে নিজেকে। এবং আয়নার মেয়েটির দিকে একনজর তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নেয়। ছিঃ! এতো শুকনো শরীর, এতো নিস্তেজ স্তন! সে যেমনটা ভাবে, এই মেয়েটা তেমন তো নয়! বাথ জেল গুলে গুলে প্রচুর বুদ্বুদ বানিয়ে বাথটবে ডুব লাগায়। অথচ শান্তি পায় না। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে অপরিমিত সুগন্ধীগুলো ছোঁয়।এ সব শৌখিন সামগ্রী তার জন্য, তার চারপাশে - এদিকে হাতে সময় বড় কম। বাবুর্চি কিশোর আসার আগেই সবটুকু না পাওয়ার আস্বাদ নিতে হবে রম্ভাকে। একলাফে উঠে পড়ে , টাবের স্টপারটা আলগা করে দেয় । হুড়মুড় করে জল বের হয়ে যেতে থাকে, সে তখন অনেকখানি লোশন হাতের তালুতে ঢেলে শরীরে ঘষে। নীল কাজল লাগায় তার চেরা চোখে, ঠোঁটে মেহগনি লিপস্টিক। তারপর চেস্টের ওপরের ড্রয়ার খোলে, বের হয়ে আসে সেই অদ্ভুত রাত পোষাক। এতো গভীর কালো, যাকে মনে হয় রাত্রিকালীন নীলাভ আকাশ। বিনা অন্তর্বাসে রম্ভা সেটি শরীরে গলায়, প্রবল অনীহায় মেম সাহেবের রাত পোষাক তাকে ধারণ করে। তার অস্থি সর্বস্ব কাঁধ থেকে সিল্কের ফিতে দুটি পিছলে নেমে এসে বে আব্রুকে আরও বেশি আব্রুহীন করে দেয় জল প্রপাতের মতো।

এই ঘরের একদিকের দেওয়াল জোড়া আয়না। সেখানে ঢলঢলে পোষাকের মেয়েটিকে দেখেই আবার কেঁপে ওঠে রম্ভা। ছিঃ! এতো কুৎসিত মেয়েটি কে? রম্ভা নয়। আর কেউ।জোরে এসি চালিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে সে। শীত বোধ প্রবল হলে মেমসাহেবের কায়দায় পা দুটি ঢুকিয়ে দেয় নরম তুলোর রাজস্থানী রেজাইটার ভিতর।আর ভাবতে থাকে।এই জীবন, এই রেজাই, নরম বিস্তর, আর নেটের গোলাপ বোনা এই কুহক রাত পোষাক, অনায়াসে রম্ভার ও তো হতে পারে! হতে পারতো! কিন্তু সে গরীবের অওঁরত হয়ে গেল। এতো খাটনির পরেও সে কি কম সুন্দরী? এখনও তাকে অপাঙ্গে দেখে দারোয়ান। এখনও সে যদি বাবুর্চি কিশোরকে ডেকে নিয়ে আসে এই ঘরে, এই নরম বিছানায়, প্রবল প্রেমে সে মর্দ কাবু হতে বাধ্য! কিন্তু সে বদ চলন থোরি! ! কোন পাপ করলো না জিন্দেগী তে তবু তার রক্তে বিমারি বিজবিজ করে! ! কোথা থেকে এলো তার সে কি জানে! খুব রাগ হয় তখন দুনিয়ার উপর। চিৎকার করে কাঁদতে গিয়ে সে দেখে এগারোটা বাজতে মোটে পনেরো মিনিট বাকি। কিশোরের আসার সময় হয়ে এলো প্রায়, দ্রুত হাতে বিছানা টানটান করে, এ সি বন্ধ করে জানলাগুলি হাট খুলে দেয়। চৈতি হাওয়া ও আলোতে ঘরের কোণায় জমাট বাঁধা ঠান্ডা ও গন্ধ গুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়। কান্নাও। সেই অভিশপ্ত গাউনটি মুহূর্তে ধুয়ে ফেলে রম্ভা। শুধু চোখের নীল কাজলরেখাটি মুছতে তার ভুল হয়ে যায়।

কিশোরের খুব মেয়েলিপনা । বাঁকা বাঁকা হাসি হাসে রম্ভার মুখের দিকে তাকিয়ে। টিটকিরি মেরে বলে- আজ ফির সে মেমসাব বনি থি ক্যায়া?

রম্ভা ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে থাকে। কিশোর ওর হাতে ফ্রেস লাইম সোডার ট্রেটা ধরিয়ে বলে- যা দিয়ে আয়। তোর মেয়ের খুন তো এবার থেকে ফ্রি তে পাবি, ম্যাডাম বন্দোবস্ত করছে, যা বারান্দায় গিয়ে দ্যাখ আর একজন এসেছে এন জিও ওয়ালি- - ’

নিঃশব্দে বাইরের বারান্দায় এসে সে দেখে, মেমসাহেবের সঙ্গে আর ও একজন। মেমসাহেব এখনও গল্পের জুতোতেই। খুব নিবিষ্ট হয়ে আলোচনা চলছে। তার মেয়েটিকে নিয়েই। দুবার বেচারি শব্দ কানে এলো তার। আগুন জ্বলে গেল মাথায়। তার দুঃখে দুনিয়ার লোকের যেন দুখ। এতো রাগ হলো রম্ভার , পিছন ফিরে নিঃশব্দে গেলাস দুটির মধ্যে একদলা করে থুথু মিশিয়ে দিল সে- - লে, শালী, লে মেরী বিমারী, ঝেল অব্- - - এ সব কথা কেউ শুনলো না। দেওয়াল ছাড়া কেউ কিছু দেখলো না।

এন জিও ওয়ালি বললো - তোর মেয়ের প্রতি মাসের ব্লাড, এবার থেকে ফ্রি। কেমন।
রম্ভা পাথরের মতো তাকিয়ে রইলো দেখে তার উৎসাহে ভাটা পড়লো।
মেমসাহেব বললো - কিছু মনে করো না। শি ইজ লাইক দ্যাট ওনলি। এক্সপ্রেশন লেস। নাইভ।

Barnali Mukherjee is a Masters in Bengali Literature from Jadavpur University, Kolkata. Her specialization is linguistics and her passion poetry. She herself is an avid reader and prolific writer of Bengali poetry and stories. She also is an elocutionist and loves to recite poetry. Some of her works have been published in DESH magazine of Anand Bazar Patrika and others have found place in other renowned Bengali magazines across the country.

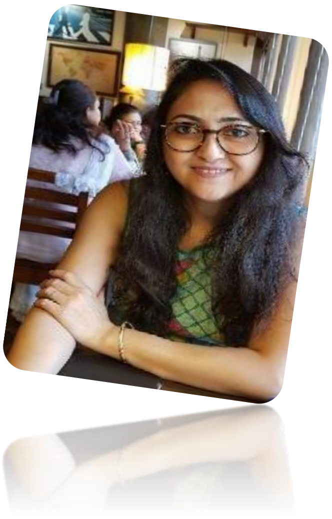

Ansh Gupta
Class I, Vidya Valley School

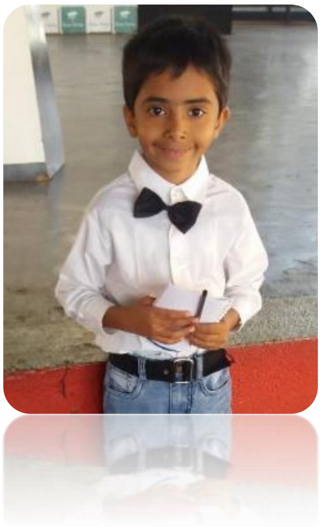

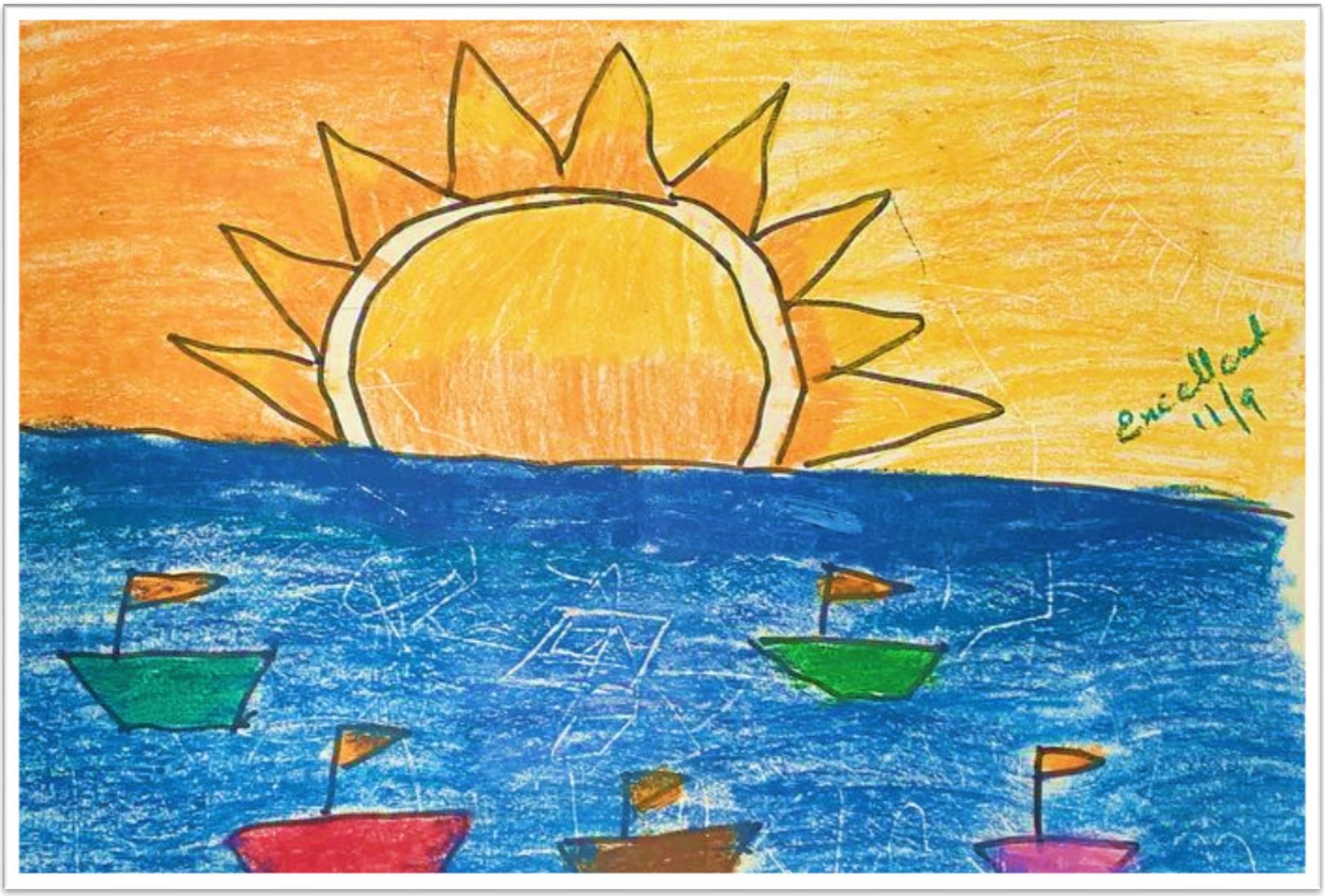
Excellent
11/9

A hope within hope…

Dibyangana Saha

It was a race against time as I frantically put last minute touches to my office presentation and got ready for work simultaneously on a busy, busy Wednesday morning. My boss had entrusted me with a final stage client presentation and it just had to be impeccable. Well, you see, a lot of the usual meaningless mundane stuff every corporate official has to endure with like, performance rating, promotion, salary hike etc. etc. depended on how this one went. And amidst all this hustle bustle I get a call from the nanny announcing she is on an unplanned leave for the next 3 days. Suddenly my entire world had just come crashing down with that 1 minute 13 second call. Nanny incognito meant me missing office altogether, for 3 straight days because the little bugger had just turned one and day care was never an option for my husband and me. Forget promotion, I would be thankful If I'm not shown the door when I finally show up on Monday at office.

A crying one year old toddler and a houseful of work was all that I could see dangling in front of my eyes. I was desperately hoping by some miracle of God my own mother got teleported in front of me and I would leave everything on her sturdy shoulders and scoot off to office. Flee off to my daily breath of fresh air far away from all this madness.

I was almost in tears when Mom in law came to my room, mainly to remind me I was getting late for work .I grudgingly replied that I will be taking leave for the next 3 days as nanny will not be coming for work. In an annoyingly calm manner she insisted I leave for office immediately.

I was very surprised with her response. After all, she had never ever 'worked 'her entire life. She has always been the butt of the whole family's jokes for that. So what did she know about the importance of my presentation? How on earth would she comprehend the importance of me gradually climbing up the corporate ladder? Because all she herself seemed to care about was visiting this particular temple on a Thursday as apparently Thursday is a very auspicious day to pay a visit to this temple and she had been bugging me about it for quite some time now. And I had been very conveniently ignoring her wishes.

That day, however, I selfishly obliged and stepped outside home to catch my office bus. I stepped outside leaving back all my fears and anxiety with her. To tick off another checkbox from my so called bucket list. To fly off from the nest with the wings my Mother in law had just provided me, though she herself never got to spread hers.

On my commute to office I started pondering upon this gracious gesture made by my mother in law and all the other things she had done for me. She was the one who had left her own home to take care of mine. She was that pillar of support who infused in me the courage to go make the world my oyster. She put her life on hold to make sure mine remained unchanged. Whilst I went out to 'work to earn money' she 'worked' at making my house a 'home' for us to return back to. And this was the 'work', this thankless job, she was doing her entire life with not so much as a twitch in her eyebrows. And we were all too shallow to realize its worth.

Despite her not being my 'own' mother and I being the 'outsider' in her family, she, out of the sheer vastness of her heart, saw in me the daughter she never had. She treated me like her 'own' daughter, and not like an ‘outsider’. She was selfless enough to not let my dreams get curbed despite hers not getting fulfilled.

She probably saw herself in me.

Probably, as my hopes got fulfilled, her hopes, which she had woven within mine, got fulfilled too.

I have seen many women consider motherhood to be a burden. As an obstacle in their ever flourishing career. However, motherhood should not be a showstopper to a woman’s career or their lifestyle. It should be a life enriching process for any woman who chooses to tread on that path. And it is on that day I realized that mothers in law like mine, though are a rare breed, make this process a cakewalk.

That day the presentation went extremely well. But instead of attending the follow up meeting the next day, I took that day off. I took my Mother in law to that temple she had been wanting to go for such a long time. Though now I am sure, there, in that temple, on that auspicious Thursday, she had probably prayed for me and the wellbeing of my family itself.

Dibyangana Saha is a risk consultant by profession and a writer, singer and fitness enthusiast by passion. Mother of a gourmet and a 5 year old chatterbox. Desperately trying to maintain the so called myth of a 'work life balance'☺. Believes in making every moment count.

৭ই সেপ্টেম্বর

কাবেরী দাশগুপ্ত

বেশ কিছুদিন থেকেই চলছিল আমার প্রতীক্ষা । কবে, কখন, কোন মুহূর্তে এসে পৌঁছাবে সে ! কত দূর? আর কত সময় অপেক্ষা করতে হবে! কখনো আনন্দে বুক দুরুদুরু, কখনো আশঙ্কায় শরীর হিম হয়ে আসছে । দূরত্ব যত কমছে, সময় যত ঘনিয়ে আসছে, অনাগতের আগমনের অপেক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠছে মন । কেমন করে আছড়ে পড়বে সে ?! কিভাবে আমি গ্রহণ করব তাকে ? ! আমি কি পারব সহ্য করতে ! সহ্য করতেই হবে । কেমন ভয় ভয় করছে কিন্তু উপায় কি ? আমি তো বাধা দিতে পারবো না । ছিঃ ছিঃ আমার এই নেগেটিভ ভাবনার জন্যই কি এত কাছে এসেও আমাকে স্পর্শ করতে পারল না। বিশ্বাস করো, সমস্ত আশঙ্কা- রাগ-অভিমান দূরে সরিয়ে সাহসে ভর করেছি। বুক বেঁধে আমার দখিন-দুয়ার সাজিয়ে রেখেছি। আমি বার্তা পেয়েছিলাম দখিন-দুয়ার দিয়েই আসবে সে। উত্তেজনা চেপে রাখা ছিল অসম্ভব । আমার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল আর মাত্র দু' কিলোমিটার। কিন্তু হায় ! কোথায় সে?? সে যে থমকে দাঁড়ালো, নিশ্চুপ হয়ে গেল। মার কোল ছেড়ে এলো কিন্তু মামার কাছে পৌঁছতে পারল না । বাড়ির দোরগোড়া থেকে সে কি হারিয়ে গেল? হায়! বসুধা, তোমার গন্ধ -স্পর্শ পাবার আশায় আমি অপেক্ষা করছিলাম। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটা নিবিড়, সে তো তোমরা জানো।

ছোট ছোট হাত নেড়ে, আদো আদো বুলিতে তোমরা যখন বলো "আয় আয় চাঁদ মামা টি' দিয়ে যা" আনন্দে হেসে উঠি । আর সেই হাসি দেখে তোমরা কতবার বলেছ --"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো ।" শুধু আলোতে ক্ষান্ত থাকো নি। কত অভিযোগ, অনুযোগ। "চাঁদ কেন আসেনা আমার ঘরে"। এসব কথা শুনে মন খারাপ হয়। জোৎস্না অনেক আদর করে ভোলায়। বলে - সোম-ইন্দু-শশধর তুমি মন খারাপ করো না, আমি তোমার প্রিয়া তোমার হয়ে, আমি সবার ঘরে পৌঁছে যেতে পারি, ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ধরিত্রীর সব সন্তানের কাছেই আমি সমান ভাবে যাই। তুমি যখন পূর্ব গোলার্ধে নিয়ে যাও তখন আমি পূর্বে আর যখন পশ্চিম গোলার্ধে নাও তখন আমি থাকি পশ্চিমের সাথে। জোৎস্নার কথা শুনে বুকের ভেতরে খোঁচা লাগে । সব কথা খুলে বলতে পারিনা । আমাকে তো অনেকেই অনুরোধ করে বলে - "ও চাঁদ, সামলে রাখো জোছনাকে" সামলে রাখতে পারি কই ? নজর তো লাগেই । লাগে বলেই তো গ্রহণ নামে আমার বুকে। যতই তোমরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাও - "ওই চাঁদ মুখে যেন লাগেনা গ্রহন, জোছনায় ভরে থাক সারাটা জীবন।"

গ্রহণকে কি আজ অবধি আটকাতে পেরেছি? গ্রহণকে কি আটকানো যায়? আমাকে নিয়ে তো তোমাদের আদিখ্যেতার শেষ নেই । সেজন্য আমিও আবেগের রসে ডুবে থাকি কিন্তু কখনো কখনো আবেগের রস ভেদ করে বাস্তবের কষাঘাত আসে। কারো কারো কাছে-- "পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"। আমি তাদের দোষ দিই না । তারা যে ক্ষুধার রাজ্যের অধিবাসী । আবার কেউ কেউ বলে--- "চাঁদের কাস্তে ধারালো হচ্ছে আস্তে আস্তে।" আমি জানি অমাবস্যার আগে পরে আমার রূপ কাস্তের মতোই হয়, কিন্তু ধারালো হয় না। ধারালো অস্ত্র তোমাদের হাতে ।তোমরা একে অপরকে সেই অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত কর, রক্তাক্ত করো। সেই রক্ত ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে। সন্তানের রক্তে মাখামাখি হয়ে মেদিনী আর্তনাদ করে। বসুন্ধরার হাহাকারে আমার নাড়ীতেও টান লাগে । আমার সেই বেদনা ক্লিস্ট মুখ তোমরা দেখতেও পাও না, বুঝতেও চাও না। তাইতো অনায়াসে বলতে পারো -"বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি গেছে বেনো জলে ভেসে , চমৎকার !ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !"

ভেসে আমি যাই না। যারা দেখার তারা দেখে, তারা বলে -"চাঁদ নেমে আসে আমার জানালার পাশে।" এসব কথা বলবার জন্যই আমি অধীর আগ্রহে বসে ছিলাম। নীল যখন এসেছিল ভালো করে তার সাথে কথা বলা হয়নি, পৃথিবীর প্রথম সন্তান আমার কাছে এলো । মামা ভাগ্নের সাক্ষাতে, আমি আনন্দে, আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। আবেগে আপ্লুত হয়ে ভালো করে কথা বলতে পারিনি।

তাই "বিক্রম" এর জন্য অধীর আগ্রহে বসে ছিলাম। যখন জানলাম ও শুধুই যন্ত্র, ওর মন নেই তখন একটু হতাশ লাগলো । মন না থাকলে কি মনের কথা বলা যায়?! তবুও, ও আসছে আমার সম্পর্কে জানতে । আমাকে নিয়ে তোমাদের কৌতূহলের তো শেষ নেই। ঐ যে কতবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছ --- "চাঁদমামা চাঁদমামা কোথায় তোমার রঙিন জামা ।" এখন তো তোমাদের বিজ্ঞান চর্চা তরতর করে এগিয়েছে, এ যুগে আর জামাকাপড় নিয়ে মাথাব্যথা নেই , পরলেও চলে, না পরলেও চলে ।এখন আমার হাড়-মাংস অস্থি মজ্জা সব তোমাদের জানা চাই। তার জন্যই তৈরি করলে "বিক্রম" কে।একে নিয়েও তো তোমাদের কম ঝগড়াঝাঁটি, কম দ্বন্দ্ব নয়। কেউ কেউ চাইছ' বিজ্ঞানের অগ্রগতি আবার কারো কারো মতে পৃথিবীতে কত কত অভুক্ত সন্তান, আর এত এত টাকা ব্যয় করে চাঁদে যাবার কি দরকার? আমি তো আবেগে চলি তাই এসব তর্ক বিতর্কের বাইরে গিয়ে, আমার পৃথিবীর স্পর্শ পেতে খুব ইচ্ছে হয়। সামান্য দূরত্বের জন্য সে স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলাম বলে মনটা খুব খারাপ। তাছাড়া ভাবছিলাম আমি "বিক্রম" এর সাথে কথা বলতে না পারলেও, আমার কথা ও তোমাদের জানাবে, ছবি তুলে পাঠাবে আর যুগ যুগ ধরে যে শুনে আসছি --"চাঁদেরও কলঙ্ক আছে ।" সে কলঙ্ক বিক্রমই ঘোচাবে। ও হারিয়ে যেতে পারে না। ও আসবেই, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একটু হালকা হতে এত কথা বললাম আজ। আমার প্রগলভতা ক্ষমা করো। আরেকটা অনুরোধ, আমার দেবার মত তেমন কিছু নেই, তবু তো তোমরাই বলেছ -- "চাঁদ শেখালো হাসতে মধুর, মধুর কথা বলতে"-- আমার এই শিক্ষাটা তোমরা মনে রেখো । ভালো থেকো।

কাবেরী দাশগুপ্ত জন্ম, ছোটবেলা, বড় হয়ে ওঠা সবই কোচবিহার; পরবর্তীকালে কলকাতা, থাইল্যান্ড এবং শেষ 15 বছর পুনেতে । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তার রয়েছে অন্তরের টান । ছাত্রজীবনে ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তব্য এই ছিল পছন্দের বিষয় । লিখতে ভালোবাসেন তবু নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় নিজেকে পাঠক দলে-ই রাখতে বেশি স্বচ্ছন্দ অনুভব করে কাবেরী ।

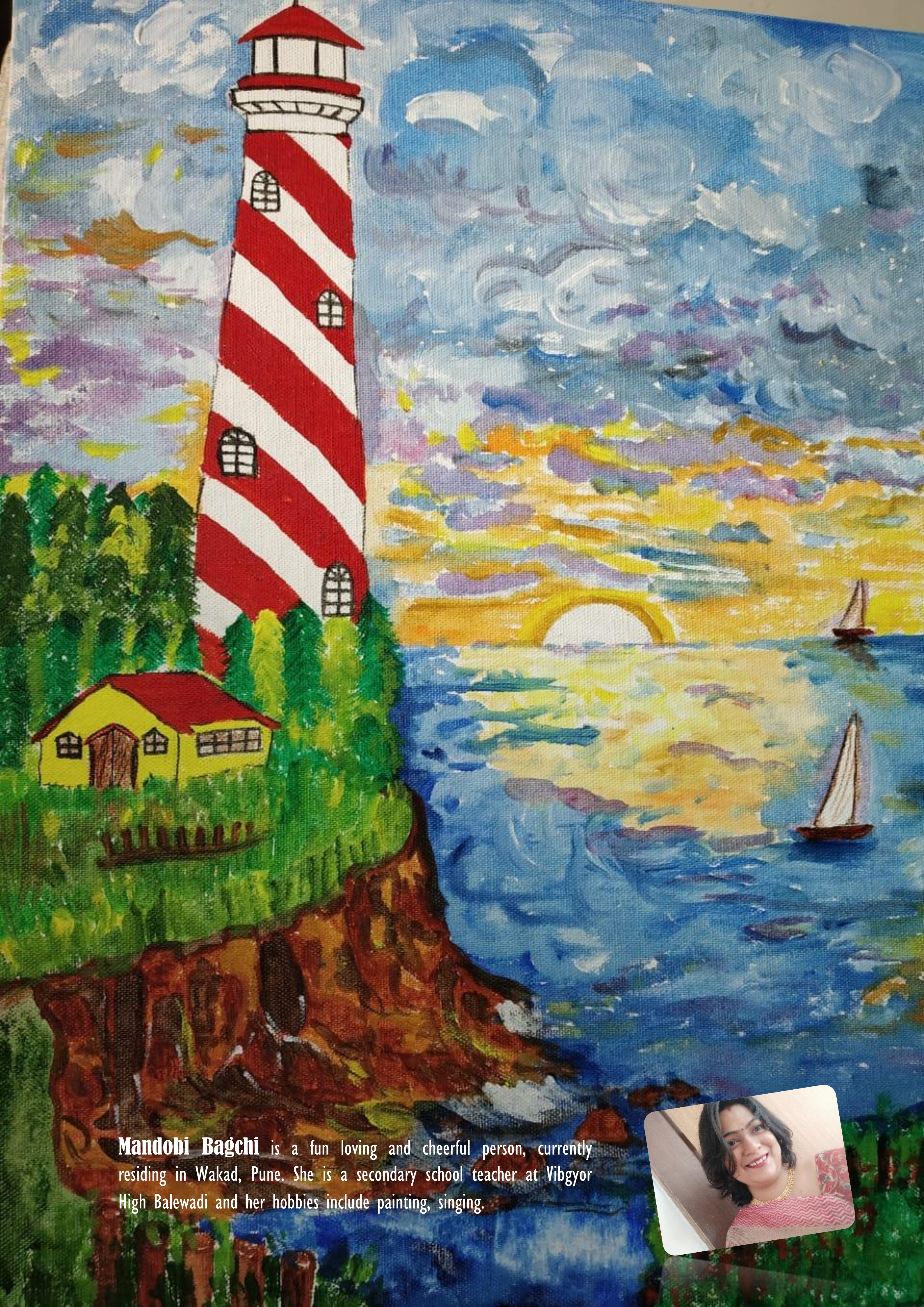

Mandobi Bagchi is a fun loving and cheerful person, currently residing in Wakad, Pune. She is a secondary school teacher at Vibgyor High Balewadi and her hobbies include painting, singing.

চাওয়া পাওয়া

চন্দ্রচূড় দত্ত

তুমি কেন আমাকে নিয়ে এলে? আমি কি তোমারে কইছিলাম?

কেন আনছি, তুমি জানো না?

আমার শরীর খারাপ। আমাকে দেখার কেউ নেই। তাই দয়া দেখাবার সুযোগ পেতেই নিয়ে এসেছ। দয়ার বদলে তুমি কি চাও আমি জানি না?

কি চাই? কি চাই আমি? পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে সুমন।

হাসপাতালের সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে তার গলা পৌঁছে যায় ইমার্জেন্সির দরজা অব্দি। দুজন নার্স থমকে দাঁড়ায়। চাপা গলায় অসভ্য! বলে ভেতরে ঢুকে যায়।

সুমন লজ্জায় মাথা নিচু করে। একটু দূরে বসে রুনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রাগ, অভিমানে তার অসুস্থ পান্ডুর মুখ লাল হয়ে গেছে। সঙ্গের রংচটা ব্যাগটাকে শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে থাকে, যার মধ্যে আছে রুনির গত তিন মাসের সুদীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসার ইতিহাস।

খুব চাপা গরম আজ সকাল থেকে। কিন্তু শহরের অভিজাত পাড়ায় গড়ে ওঠা এই নতুন পঁচিশতলা বিলাসবহুল এপার্টমেন্টে তার আঁচ নেই। এখানে সবদিন একই উষ্ণতা, একই

আর্দ্রতা, এক আবহাওয়া। বাইরের হাওয়া এখানে ঢোকার পথ পায়না। শুধু যখন বৃষ্টি হয়, সিলিংছোঁয়া কাঁচের দেওয়াল বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা - মনে হয় বাইরের, অনেক নীচে, অনেক দূরের পৃথিবীটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে কেউ।

এখন বৃষ্টি নেই, বাইরেটা ধোঁয়া ধোঁয়া। কাঁচের দেয়ালের বাইরে সাজানো manicured বাগানের দিকে তাকিয়ে লেমনেডের গ্লাসে চুমুক দেয় পরভেজ। কালকের শেষরাতের পার্টিটা এখনো মাথায় হালকা ছোঁয়াচ দিয়ে রেখেছে। আগের রাতের কথা মনে পড়তে পরভেজের ঠোঁটে হাসি ফোটে। একটা দীর্ঘ চুমুকে লেমনেডটা শেষ করে দামী মোবাইলটা চার্জিং থেকে খুলে অন করে। টিং। নতুন whatsapp মেসেজ। Good Morning ।

উত্তর লিখতে সময় লাগেনা । Loved it yesterday 😘😘।

এগারোটা বাজে। রুনির ডাক্তারবাবু আজ দেরিতে এসেছেন। রুগীর ভিড় ছাড়িয়েছে প্রায় পঞ্চাশ। আউটডোরে টিকিট কেটে রুনিরা দাঁড়িয়ে আছে আটটা থেকে। রুনি আকাশের দিকে তাকায়। প্রচন্ড রোদে আকাশটা উজ্জ্বল, অনেকক্ষন তাকিয়ে থাকলে মনে হয় পতপত করে কাঁপছে। রুগীদের জন্যে বানিয়ে দেয়া টিনের চাল দেওয়া অপেক্ষাগৃহে প্রচন্ড গরম। দরদর করে ঘামছে সবাই। রুনির বাড়ির কথা মনে পড়ে। সকাল সকাল সুমনের সঙ্গে ঝগড়া করে আরো বেশি করে বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

রুনির বাড়ি এই শহর থেকে অনেকদূর। একই ভাষা, একই রকম খাওয়া দাওয়া, তবু বেশ বোঝা যায় যে এ দেশ তার নয়। আম, কাঁঠালের বাগিচা, শীর্ণ নদী, বিস্তৃত মাঠ সব মিলিয়ে এই শহরের সাথে কিছুই মিলিয়ে উঠতে পারে না। এখানে সবাই দৌড়ায়, সবাই ব্যস্ত। গ্রামে শাজাহান কাকা কোন কোন দিন গোটা সকালটা রুনির বাপের সাথে গল্প করে কাটিয়ে দেয়। বাপের কথা মনে পড়তে রুনির বুকটা চিনচিন করে। বাপ কি তার আছে! চলো আমাদের ডাকছে। সুমন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রুনি মুখ তোলে। সুমনের গলাটা হঠাৎ তার বাপের মত শোনায়।

পরভেজ জাগুয়ার গাড়িটা নিয়ে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে ফোনটা এলো।
Hey Good Morning.
তোর সঙ্গে কথা আছে। আজ দেখা করবি?
গলাটা এরকম শোনাচ্ছে কেন? কাল রাতেই তো একসঙ্গে ছিলাম।
দেখা হলে বলব। তুই বেরিয়েছিস?
হ্যাঁ। Just। এয়ারপোর্ট যাচ্ছি, ভাই আসছে। Flight on time.
ও হ্যাঁ। ঠিক আছে। পরে কথা বলব। Bye...
Bye...

পরভেজ এই শহরের নামী ব্যবসায়ী পরিবারের বড় ছেলে। জন্ম থেকে প্রাচুর্য আর বিলাসবহুল আবহে বড় হয়ে পরভেজ নিজের জীবনটা নিজের মত গুছিয়ে নিয়েছে। পারিবারিক ব্যবসার সে একজন কর্ণধার। ন' তলার এপার্টমেন্টটা তার নিজস্ব, তাই বলে এরকম নয় যে সে বাড়ি যায় না। আজ ভাই আসছে বিদেশ থেকে, আজ রাতটা সে বাড়িতেই থাকবে।

বিকেল থেকে মেঘ করে গুমোট হয়ে আছে। সন্ধে হয়েছে অনেকক্ষন। ট্রাফিকের হাঁসফাঁস রাস্তা জুড়ে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সুমন আর রুনি হাঁটছে। মনের মধ্যে জমানো মেঘ নিয়ে, পাশাপাশি।
আমি আর এখানে থাকব না। ফিরে যাব। সারাদিন ধরে এত ওষুধপত্র, ডাক্তার আর ভালো লাগছে না।
সেরে ওঠো আগে। সুমন সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।
স্বার্থপর। আমি সেরে উঠলে তোমার কি লাভ জানি না আমি? রুনির গলায় ঝাঁঝ।
দেশে কে আছে তোমার? যার দেখার কথা সে তো...
বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এই তো? তা আমার কি বাপ মা নেই?
তারা তোমাকে নেবে? দেখবে?
এখন তো তোমার জন্যেই নেবে না। দিনরাত আমায় মন্তর দিয়ে ফুসলে নিয়ে এলে এই বিদেশে। কে বলেছিল তোমাকে দয়া দেখাতে? তোমার দয়া ছাড়া আমি কি মরে যাচ্ছিলাম?
না। তুমি অসুখে মরছিলে। Breast Cancer ভুলে গেলে? সুমন চোখে জল নিয়ে কথাগুলো বলে ফেলে। আর ঠিক তখনই আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে।

বল। কি এমন কথা যা ফোনে বলা যাচ্ছিল না। আমরা আজ সেলিব্রেট করছিলাম। ভাই এতদিন পরে এলো। পরভেজের গলায় হালকা টোল। চোখে আলগা নেশা।
তুই নেশা করে ড্রাইভ করবি জানলে আসতাম না।
তুই ডাকলে না এসে থাকি কি করে বল? এইটুকু নেশায় আমার কিছু হয় না। বৃষ্টিটা দারুণ হচ্ছে। কোলাঘাট যাবি?
Do you love me?
মানে? এটা জিজ্ঞাসা করার জন্যে তুই আমার সন্ধেটা মাটি করলি?
Will you marry me?
Don't be silly. তুই ভালো করেই জানিস আমি এটা করতে পারব না।
তাহলে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক কিরকম?
Friends। আমরা বন্ধু।
তোর এপার্টমেন্টের নিভৃতির পরিচয় জানতে চাইনি। সমাজে এই সম্পর্কের পরিচয় কি?
Why do you want to ruin everything?

শহরের রাস্তায় বৃষ্টি নামে। সিগনালে সবুজ আলো। পরভেজ গাড়ি ছুটিয়ে দেয়।
I can’t lose everything I have just for you. তুই - আমি, আমাদের কেউ মেনে নেবে না। এই গাড়ি, বাড়ি, স্ট্যাটাস কিছু থাকবে না। আমাদের পরিবারের একটা সম্মান আছে। Be practical.

বৃষ্টি ঝেঁপে এসেছে। সামনেই একটা ট্রাফিক পুলিশের কিয়স্ক। মাথা বাঁচিয়ে সুমন আর রুনি ঢুকে পড়ল। ছোট্ট জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। সুমনের চোখের দিকে যাতে না তাকাতে হয়, তাই রুনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে বৃষ্টি আর জমাট বাঁধা অন্ধকার। ছোটবেলা থেকে বৃষ্টি রুনির খুব প্রিয়। বৃষ্টি পড়লেই ঘরের জানলা একটু খুলে বিদ্যুতের ঝলকানি, ঠান্ডা হাওয়া আর হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল নিতে তার খুব ভালো লাগে। হাতটা সামনে বাড়িয়ে দেয় রুনি। ঠান্ডা জল আঙুল ভিজিয়ে হাতের মুঠোয় জমে উপচে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে। সুমন না থাকলে এসব হয়তো আর দেখাই হত না। হঠাৎ সুমনকে জড়িয়ে ধরে রুনি ডুকরে কেঁদে ওঠে।
তুই না থাকলে হয়তো আর কোনোদিন বৃষ্টি দেখতে পেতাম না রে। তুই সব ছেড়ে শুধু ভাঙাচোরা আমায় নিয়ে কি পাবি সুমন? আমায় এত ভালো তুই কি করে বাসলি?

*****

...গতকাল রাত্রে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে শেক্সপিয়র সরণি ও লাউডন স্ট্রিটের মোড়ে একটি দ্রুত গতির জাগুয়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ট্র্যাফিক পুলিশের কিয়স্কে। ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে একজন যুবক ও একজন যুবতী, দুজনেই বাংলাদেশি নাগরিক, কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসা দ্বিতীয় যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। গাড়ির চালক পলাতক, পুলিশ সন্ধান করছে...

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন এর প্রাক্তন ছাত্র **চন্দ্রচূড় দত্তের** নেশা নাটক ও বাংলা লেখালেখি। পড়াশুনা আর চাকরি - বেশির ভাগ সময় প্রবাসে কাটানোয় প্রচুর মানুষকে চেনার, কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়; লেখালিখির কাঁচামালের যোগান আসে সেখান থেকেই।

অপাঠ্য- পুস্তক

সুশান কোনার

যে বয়সে সাধারণ বালিকাকুল জেন অস্টেন পড়িয়া আপ্লুত হইয়া থাকে, সেই বয়সে শ্রীমতী অস্টেন এর সহিত পরিচয় হইবার আমার সুবিধা ছিল না। তৎকালে, অর্থাৎ ৭০ এর দশকে, ইন্টারনেট-হোয়াটসআপ সম্বলিত স্মার্টফোন জাতীয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হইবার পূর্বে, উত্তর কলিকাতাস্থ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠরতা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বালিকার সহিত রানীর ভাষার অন্তরঙ্গতা তেমন থাকিত না। কাজেই তিন- চারিশত পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজি উপন্যাস পাঠ তাহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

বিশ্ব রোমান্স সাহিত্য, অর্থাৎ নিখাদ প্রেমের গল্পের আসরে পদাতিক (বা বটতলা) তকমাধারী, বহুল প্রচলিত **Mills & Boon (MB)** ও ছিল আয়ত্বের অতীত - কারণ একই। আর ভাষা সমস্যা যে কি আশ্চর্যপ্রকার বিড়ম্বনার কারণ হইতে পারে - তাহা নিজ অভিজ্ঞতায় না জানিলে প্রত্যয় হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে রসায়নবিভাগের এক তরুণী আমাদের সহিত একই ছাত্রীনিবাসে বসবাস করিত - তাহার পিতৃদেব তৎকালে বিদেশ মন্ত্রকে কার্যরত। তিনি সহসা দিল্লী হইতে ওলন্দাজদের রাজধানী আমস্টারডাম বদলি হইয়া গেলেন। সঙ্গে যাইল পরিবার। বান্ধবী বিদেশ হইতে বিস্তর আক্ষেপ করিয়া পত্র লিখিল - "এ দেশের আর সকলই উত্তম। কেবল হতভাগা ওলন্দাজগুলা শুধুমাত্র ডাচ ভাষাতেই MB বিক্রয় করিয়া থাকে।" বিড়ম্বনাই বটে !

কিন্তু সে পরবর্তীকালের ঘটনা। ইশকুলবেলায় আমাদের ত্রাণকর্তা ছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার সমস্ত রচনাতেই কিঞ্চিত প্রেমের ছোঁয়া পাওয়া যাইত। কিশোরী বয়সে পাঠ্যবস্তুর সাহিত্যমূল্যের অপেক্ষা সেইটির আকর্ষণই ছিল অধিক। আর ছিলেন শ্রীযুক্ত আশু মুখুজ্জে মহাশয়। পরশুরাম এর মতে বেয়াদপি দেখিলে যিনি ডিকশনারি হস্তে তাড়না করিতে আসিতেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপুটে কর্ণধার, বাংলার বাঘ আশু মুখুজ্জে - ইনি সেই তিনি নহেন। ইনি পঞ্চতপা-খ্যাত। রোমান্সের গন্ধ পাইবার আশাতেই যাঁহার উপন্যাস লইয়া আমরা কাড়াকাড়ি করিতাম।

MB র সহিত আমার পরিচয় হইল দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠকালীন। রাণীর ভাষা লইয়া আমার লাঙ্গুলিগোময় অবস্থা দেখিয়া কোন সহৃদয়া সহপাঠিনী একটি উপায় বাতলাইলেন - **MB** অতি সহজপাচ্য প্রেমকাহিনী (অর্থাৎ পাত্রপাত্রী নির্বিচারে কাহিনী মূলত এক, স্বনামধন্য জটায়ুর ভাষায় - থোড়- বড়ি- খাড়া) এবং ইহা পাঠ করিলে নাকি চটজলদি কথ্য ইংরাজি শিখিয়া লওয়া যায়। উত্তম প্রস্তাব। তবে কিনা - লাও তো বটে, কিন্তু আনিবে কে। পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর কন্যাটিকে রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের সন্যাসিনীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে নদীনালা চষিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া ইতঃপ্রকার অ- পাঠ্যপুস্তক হস্তে আসিবে কি প্রকারে? উপায় হইল তখন, যখন আমার পিতৃস্বসার কন্যা উত্তরপ্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার ইশকুলে ভর্তি হইল। কিঞ্চিত বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও সে শিশুকাল হইতে ইংরাজী- মাধ্যমে শিক্ষিতা, চলনে- বলনে বিশিষ্টা, বলিউডের সমস্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত তাহার কণ্ঠস্থ তায় ডাকসাইটে সুন্দরী - অতঃপর আশৈশব সন্যাসিনি সান্নিধ্যে কাটানো বোকাহাঁদা জ্যেষ্ঠাটির বিপদতারণ।

রায়বাঘিণীসদৃশ মাতুলানীর (অর্থাৎ মদীয়া মাতাঠাকুরাণী) শ্যেনচক্ষু এড়াইয়া সে আমাকে নিষিদ্ধ পুস্তক দুই- একটা আনিয়া দিল। ইংরাজি শিক্ষায় তাহার ফল কিরূপ হইয়াছিল বলিতে পারিনা, তবে প্রেমের

গল্পের নেশাটি ধরিল। আর ধরিল এরূপ সময়ে যখন দিবসে অধ্যাপিকাগন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শিখাইতেছেন, অন্যদিকে কমলকুমার মজুমদার মহাশয়ের ' অন্তর্জলি যাত্রা' আদি পাঠ করিয়া শিহরিত রাত্রি নিদ্রাহীন কাটিতেছে - ঠিক সেই সময়ে সমুদ্র পার হইতে 'junk literature' এর ঢেউ সবেগে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পরে কতকাল কাটিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া গবেষণা শুরু করিলাম। তখন দিবারাত্রের হিসাব নাই। যে অঙ্ক এক একটি কষিতে উন্নত যন্ত্রগণকের সমস্ত দিবস লাগিয়া যায়, সেইরূপ অঙ্ক কয়েকশত করিতে পারিলে তবেই গবেষণার পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। অতঃপর দিবসান্তে, সকলের কাজ সমাপ্ত হইলে, যন্ত্রগণকগুলি যখন কিঞ্চিত কর্মহীন - তখনই আমার অঙ্কগুলি করিবার প্রশস্ত সময় স্থির করিলাম। তৎকালে না ছিল UPS (uninterrupted power supply), না ছিল সম্যক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাদি - কাজেই রজনী কাটিত যন্ত্রগণকগুলির প্রহরায়। কৃচিৎ কদাচিৎ গণনাকক্ষেই নিদ্রা-স্থলী আশ্রয় করিয়া ভূমিশয্যা। প্রায়শই উপন্যাসাদি সম্বল বিনিদ্র রজনী যাপন। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, গবেষণার উৎকণ্ঠা - সমস্ত মিলিয়ে মস্তিষ্ক খুব সজাগ থাকিত এমন নহে। কাজেই জাগরণকালের ভরসা - স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে আনীত MB গুলি।

তাহারও পরে অনেক কাল গত হইল। মস্তিষ্ক শ্রান্ত হইলেই MB খুঁজিবার বদ অভ্যাসটি যাইল না। একদা বিমানবন্দরে পুস্তকবিপণীর উদ্দেশ্যে (ইদানীং কালে সেগুলি ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হইতেছে বটে) অগ্রসর হইতেছি, মাত্রই চারিটি গ্রীষ্ম পার করিয়া আসা কন্যাটি কলবল করিয়া উঠিল - ঐ মা যাচ্ছে, এখুনি MB কিনবে। তাহা শুনিয়াই কিনা বলিতে পারিনা, তবে মনে হইল - কন্যা কিশোরীবয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্বে অন্তত শ্রীমতী অস্টেন, যিনি কিনা এই নিখাদ প্রেমের গল্পের পথিকৃৎ হিসাবে খ্যাত, তাঁহার রচনা কিঞ্চিদধিক পাঠ করা নিতান্তই আবশ্যক ।

দুই একজন ভগিনী-প্রতিম বান্ধবী বলিলেন তাঁহারা প্রায়শই অস্টেন পড়িয়া থাকেন। মন খারাপ হইলে বা শ্রান্ত বোধ করিলে। ভাবিলাম তবে তিনি সহজপাঠ্যই হইবেন। কিনিলাম। কিন্তু সেগুলি আলমারি হইতে নামাইব ভাবিলেই আলস্য ধরিয়া ফেলে। এইরূপেও কয়েক বৎসর কাটিল। অতঃপর, ' করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' এইরূপ পণ করিয়া, উপন্যাসগুলি kindle এ সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে নিয়ম করিয়া অস্টেন পাঠ করিতে লাগিলাম।

হায়, বালিকা বেলায় যাহা পাঠ করিলে রোমাঞ্চ হইতে পারিত, পৃথিবীতে অর্ধশতক পার করিয়া আসিয়া তাহাই নিরতিশয় বিরক্তিকর বোধ হইল। ইতিমধ্যে শত-সহস্র MB গলঃধকরণ করা হইয়া গিয়াছে। অস্টেন এর সমকালীন এবং ঐতিহাসিক ইংরাজি সাহিত্য আস্বাদন করা হইয়াছে। দেখা হইয়াছে সেই যুগের কাহিনী লইয়া নির্মিত একাধিক চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শন কাহিনী। যাহা পাঠ করিবার জন্য এক কিশোরী কোনকালে অধীরা হইতে পারিত, আজ চারিটি দশক পার করিয়া আসিয়া এই পক্ককেশ প্রবীণার কাছে তাহা সত্য সত্যই অপাঠ্য-পুস্তকে পরিণত হইয়াছে।

Sushan Konar is an Astrophysicist who not only loves to write but also has the terrible habit of subjecting unsuspecting people to impromptu lectures. The result of this combination is a weekly blog called 'Monday Musings' (https://sushan-konar-musings.blogspot.com/) posted on, not surprisingly, every Monday.

Rajyasree is an ardent lover of Painting and Music. Being a Master's in Botany from Presidency College Kolkata, she has also completed Diploma in Fine arts from Viswa Bharathi University. She is an avid nature lover and is extremely fond of singing. Music flows through her paint brushes and brings life back on the canvas.

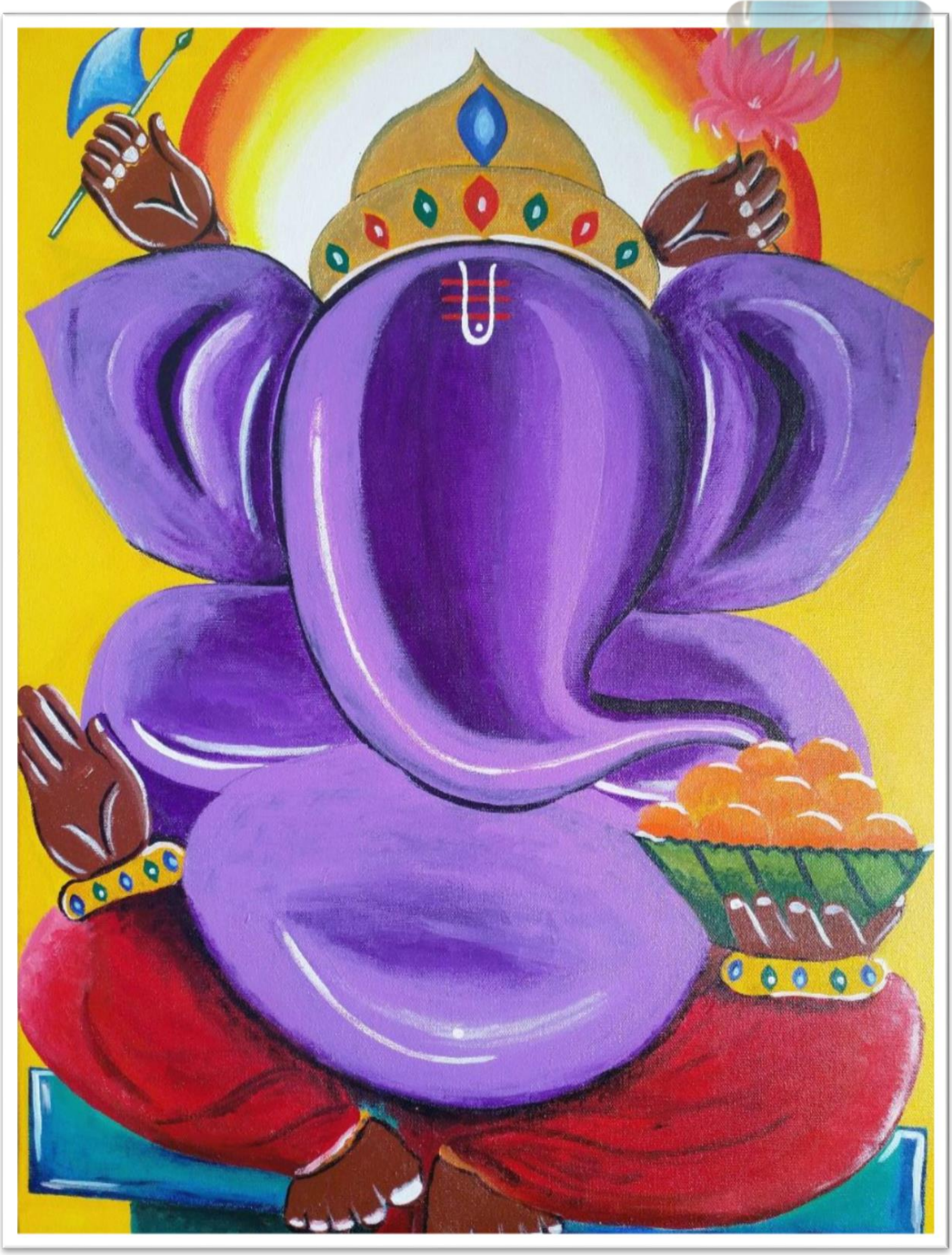

THE WORLD OF PPBP…

PPBP's new Managing Committee

Bidyabijay Bhaumik
President

N.L. Laskar & Sandeep Munshi
Vice Presidents

Tanmoy Bandyopadhyay
General Secretary

Soumyadarshan Biswas
Treasurer

Debapratim Sikidar, Geeta Chowdhury, Sriparna Dhar, Subashis Mitra
Joint Secretaries

PPBP’s Gala Tribute to the Teen Purush!

AGE CAN’T STOP US FROM ENJOYING LIFE!

WHEN MEMBERS BECOME A FAMILY!

MEMORIES OF YEARS PAST…

PPBPians OUTSIDE PPBP…

श्रीमती शांतीदेवी गोपीचंद गुप्ता विद्यालय
व कनिष्ठ महाविद्यालय, मळवली-भाजे

SOCIAL SIDE of PPBP…

সম্পাদক

পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ পূজা কমিটি

© Manjusha Ganguly